শহরের মোহ

হরের মোহ

আশালতা সিংহ

ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস্।
৬০, বিডন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

আষাঢ়—১৩৪৪।

মূল্য দেড় টাকা

প্রথম সংস্করণ

৬০, বিডন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
ফাইন আর্ট প্রেস হইতে
শ্রীরাধারমণ দাস কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

উৎসর্গ পত্র।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ও, বি, ই,

করকমলেষু।—

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনি যে আপনার এই গুরুভারময় দুরূহ রাজ-কার্য্যের অবসরেও এমন অনুরাগ ও আন্তরিকতার সহিত সাহিত্যের সেবা করেন, তা দেখে আমি বিস্মিত হ'য়েছিলুম। আমার শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আপনাকে উৎসর্গ করিলাম।

ইতি—

বিনীতা—শ্রীআশালতা সিংহ।

৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬।

আমাদের কয়েকখানি প্রকাশিত পুস্তক—

——:০:——

১। কথা সাহিত্যের যাদুকর—

শৈলজানন্দের দুইখানি মনোমুগ্ধকর

— উপন্যাস —

অনাথ-আশ্রম—২৲

হোমানল—১৲

২। — স্বনামধন্যা লেখিকা —

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—

দীপের আলো—১৷৹

৩। — শক্তিমান লেখক —

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের—

জীবনের জটিলতা—১৷৹

৪। ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট

— উপন্যাস —

পুরনারী—১৷৹

৫। চিন্তাশীল সুলেখক—

আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের অভিনব

— উপন্যাস —

হাওয়া বদল—১৷৹

সহরের মোহ

(১)

রান্নাঘরের খড়ে-ছাওয়া চালা বহুদিনের সংস্কারাভাবে একান্ত শীর্ণ হইয়া গেছে। ফাল্গুনের শেষের দিকে ধূলা উড়াইয়া ঝড় বহিতেছে। চালের ছিদ্র দিয়া ধূলা-বালি খড়-কুটা ঘরময় ছড়াইয়া যাইতেছে। শান্তা একখানা ঝাঁটা হাতে সেই সমস্ত আবর্জ্জনা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছিল। অদূরে বারান্দায় পুরান মাদুর বিছাইয়া তাহার সাত বৎসরের কন্যা শোভা শ্লেট বই সামনে রাখিয়া একমনে পড়িতেছে। বহির্ব্বাটী হইতে প্রকাশবাবু আসিয়া স্ত্রীকে কহিলেন, "ওগো, বাইরে মুন্সেফবাবু এসেছেন, চট্ করে পেয়ালা দুই চা তৈরী করে দাও দেখি।"

"আচ্ছা পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি বাইরে যাও, গোপালকে পাঠিয়ে দাও, তারই হাতে দিচ্ছি।"

"দেখো বেশি দেরী হয়না যেন।" প্রকাশবাবু যেমন করিয়া আসিয়াছিলেন তেমনই করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

সহরের মোহ

কাঠের উনান জ্বালিয়া শান্তা কেৎলি চড়াইয়া দিল, তাপরে এক পয়সা প্যাকেটের পাতা চা একটুখানি তাহাতে ফেলিয়া ল চা সমেত কেৎলির জল ফুটিতে লাগিল।

শান্তা সেই জ্বলন্ত আগুনের দিকে শ্রান্ত অবসাদগ্রস্তভাবে চাহিয়া রহিল। বাইরের তপ্ত মধ্যাহ্নবেলার রুক্ষ ঝড়ের সহিত যেন তার জীবনের বড় মিল আছে।

শোভা শ্লেটে একটা অঙ্ক কষিতেছিল, মায়ের কাছে সরি আসিয়া বলিল, "মা এইখানটা বুঝতে পারচিনে, একটু বলে দাওনা।

শান্তা তাহাকে সরাইয়া দিয়া কহিল, "যা-যা, এখন বিরক্ত করিসনে, তোর বাবা চা চেয়ে গেছেন, দেরী হ'লে বিরক্ত হবেন।"

শোভা ক্ষুণ্ণমনে সরিয়া গেল। আর একবার শ্লেট বই লইয়া নাড়া-চাড়া করিল, তারপরে সে সমস্তই গুছাইয়া রাখিয়া, বারান্দার এককোণে গুটিকয়েক মাটির পুতুল ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কয়েকটা পুতুলের কাপড় লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

শোভার মা চা করিতে করিতে একবার করুণ নয়নে মেয়ের দিকে চাহিলেন বড় ইচ্ছা করে মেয়েকে লইয়া গল্প করেন, তাহাকে পড়া-শোনা একটু দেখাইয়া দেন; কিন্তু সময় নাই। সংসারের চক্রনিষ্পেষণে সমস্ত দিনের সমস্ত মুহূর্ত্তগুলি তাঁহার ধূলায় গুঁড়াইয়া যাইতেছে।

শোভা পুতুল খেলিতে খেলিতে ভয়ে ভয়ে বলিল, "মা, আমাকে একটু চা দেবে?"

"মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আর একটু আগে কেন বললিনে শোভা, এইতো সদরে পাঠিয়ে দিয়ে যেটুকু বাকী ছিল, আমি খেয়ে ফেললুম। আবার তৈরী করতে পারিনে।"

"না না, দরকার নেই। আমি আবার কাল সকালে খাব।"

শান্তা উঠিয়া পড়িল। কুঁয়াতলার পাশে তখনও একরাশ বাসন পড়িয়া আছে, মাজিতে হইবে। রাজ্যের কাজ বাকী। শোভা পুতুল খেলিতে খেলিতে কখন সেইখানেই মাটির উপর শুইয়া ঘুমাইয়া গেছে। শান্তা একবার তাহার দিকে চাহিয়াই আবার পরক্ষণে পোড়া কড়াইটা ঘষিয়া মাজিতে লাগিল।

* * * *

অথচ চিরদিন এমনই করিয়া কাটে নাই। এই শোভা যখন পৃথিবীতে আসে নাই, তখন তাহার সম্ভাবিত আসন্ন আগমন কল্পনা করিয়া কত না স্বপ্ন কত কল্পনার জাল বুনিয়া চলিত তার মা। রাত্রির অতন্দ্র প্রহরগুলি নিমেষহীনভাবে চাহিয়া থাকিত। শান্তা বিছানায় শুইয়া খোলা জানালা দিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া মনে মনে ভাবিত, আমার প্রথম সন্তান যদি ছেলে হয়, তবে ভাবনা করিবার বিশেষ কিছু নাই, আপনার মর্য্যাদায় সে পরিবারে যথার্থ স্থান অধিকার করিয়া লইবে। কিন্তু যদি ছেলে না হইয়া মেয়ে হয়······এক নিমেষের জন্য তাহার নিঃশ্বাস পতনের ছন্দ যেন থামিয়া

যাইত, পরক্ষণে গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিত, "তাহো'ক, আমার কাছে ছেলেতে মেয়েতে কোন তফাৎ নেই। আমার মেয়েকে যথাসম্ভব আমি শিক্ষিত করব। আজকাল মেয়েরা কত বড় বড় কাজ করচে।"

খিড়কির দুয়ার দিয়া ঠিকা ঝি আসিয়া অপ্রতিভের মত হাসিয়া কহিল, "মা যে দেখচি নিজেই বাসন মাজতে নেগেচে, আমি আসতে পারি নাই, আমার বোনঝির বাড়ীতে অসুখ, কেউ নেই, সেখানেই গিয়েছিলুম।"

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া শান্তা হাতের কাজ ফেলিয়া বলিল, "কি করব বলো, তুমি বলে গেলে না। এখন আমি লোক পাই কোথা থেকে। এই পনেরো দিন ধরে সমস্ত কাজই আমাকে করতে হয়েচে, কষ্ট হয়েচে খুব।"

ঝি আসায় অনেকদিন পরে মনের ভার একটু হালকা হইল। একটু সময় হইল। মেয়েকে অকাল দিবানিদ্রা হইতে তুলিয়া দিয়া আদর করিয়া বলিলেন, "শোভা মা, ওঠ। বিকেল হয়ে গেছে। আজ মুন্সেফবাবুর বৌ আমাদের বাড়ী বেড়াতে আসবেন। ঘর-দুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে। আয়, আমার সঙ্গে একটু লেগে দিবি। তোরও চুলটা বেঁধে দিই। জামাটা ছেড়ে ফেল। ওবেলায় তোর ফ্রকে সাবান দিয়ে রেখেচি, সেইটে পরবি।"

শোভা মহা উৎসাহে উঠিয়া পড়িল, ক্ষিপ্রহস্তে একটী ডালাভাঙ্গা

পুরাতন বাক্সে তার পুতুল খেলার সরঞ্জাম গুছাইয়া রাখিতে লাগিল।

প্রকাশ উৎসাহদীপ্ত মুখে সদর হইতে আসিয়া স্ত্রীর উদ্দেশে ডাকিল, "ওগো শুনচ!"

শান্তা স্বামীর আহ্বানে সাড়া দিয়া বলিল, "এই যে, আমি মেয়েটার চুল বেঁধে দিচ্ছি।"

স্বামীর উৎসাহদীপ্ত মুখের পানে চাহিয়া উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল, প্রকাশ বলিয়া চলিল, "আর কি, এইবারে বাঁধা কেসগুলো সব হাতে আসবে। মুন্সেফবাবুর কথার ভাবে যেন মনে হ'লো। ভারি ভালো লোক, অতিশয় সজ্জন। দেখো আজ ওঁর স্ত্রী এলে খুব আদর-যত্ন ক'রো।"

প্রকাশ যেমন আসিয়াছিল তেমনই উৎসাহভরে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

শান্তা স্বামীর এই ভাবকে বেশ চিনে। আজ আট বছর ওকালতী প্র্যাক্‌টিস করিতেছেন, এখনও বাসাখরচ পুরাপুরি চলে না। সেভিংস ব্যাঙ্কে কিছু ছিল, তাই ভাঙ্গিয়া টানাটানি করিয়া খরচ চলে। অথচ ভদ্রলোক এততেও এতটুকু দমেন নাই। অল্পতেই অনেকখানি আশা করিয়া ব'সেন। একদিন মুন্সেফবাবু চা খাইয়া গেলেই তাঁর মনে হয়, মুন্সেফ কোর্টের সব মকদ্দমাগুলা তাঁর হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। এই আশার সুর তাহাকে কতদিন কতভাবে

মুগ্ধ করিয়াছে, স্বামীর কথায় বিশ্বাস করিয়া মনে করিয়াছে, সত্যই, বুঝি এখন হইতে সচ্ছলতার দিন আরম্ভ হইল, আর বড় বেশি দেরী নাই। সৌভাগ্যের আলোকময় শিখর এখান হইতেই বুঝি চোখে পড়ে। কিন্তু বারংবার সে আশা অকালে নিভিয়া গেছে। অনেক দিন অনেক ঘা সহিতে হইয়াছে। তাই আজ স্বামীর কথায় শান্তার মুখে একটুখানি অবিশ্বাসের হাসি ছাড়া আর কিছুই ফুটিল না।

শোভার চুলের বিনুনী করা শেষ হইয়া গিয়াছিল, তাহারই প্রান্তভাগে লাল ফিতার ফুল ঝুলাইয়া দিতে দিতে শান্তা বলিল, "গা মুছে তোর ফ্রক আর চটিটা পরে নিস। আমি ওপরে চললুম ঘর-দুয়োর একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করি।"

পুরান বাড়ী। একতলায় রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, কল, চাকরদের থাকিবার একখানা ঘর আর সদর। উপরে একটুকরা ছাদ এবং খানদুই শয়ন কক্ষ। ইহারই একটীকে শান্তা একটু সাজাইয়া পরিপাটি করিয়া বসিবার ঘরের মত করিয়াছে। সুরুচির সহিত দারিদ্র্যের সংঘর্ষ সেই ঘরের প্রত্যেকটী জিনিষে দেদীপ্যমান। জানালাগুলিতে সস্তাদামের খদ্দর গাঢ়বর্ণে রাঙাইয়া তাহার পর্দ্দা ঝুলিতেছে। একটী টেবিলের উপর পুরান কাপড়ের পাড়ের সূতা তুলিয়া নক্সা কাটা টেবিল ক্লথ। চারিপাশে চারটী বেতের চেয়ার। চেয়ারগুলিতে কুশান দেওয়া। একটী শেল্‌ফে কিছু বাংলা বই সাজান আছে। একটী ছোট চৌকির উপর সেলাইয়ের কলটী সযত্নে

রক্ষিত। ছেঁড়া কাপড়ের পাড় যোগ দিয়া একটী আস্তরণ প্রস্তুত হইয়া কলটীর উপর ঢাকা দেওয়া আছে। দেয়ালের গায়ে কাচ বসানো একটি আলমারি। সেইটি খুলিয়া শান্তা তাহার ভিতর হইতে চায়ের প্লেট এবং পেয়ালা কয়েকটি বাহির করিল। একটুকরা পুরান কাপড় লইয়া আসবাবপত্রের যেখানে যাহা কিছু ধূলা জমিয়াছিল তাহা ঝাড়িয়া দিল। টেবিলের উপরকার আচ্ছাদনটি তুলিয়া দিয়া আর একটি ধোপদস্ত আবরণ পাতিল। ঘরের মেঝেগুলি ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করিল। তারপরে চুল বাঁধিয়া গা ধুইয়া রান্না চড়াইয়াছে, এমন সময়ে বাইরে মোটরের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল। জলের হাঁড়িতে আরও খানিকটা জল ঢালিয়া দিয়া শান্তা মুন্সেফবাবুর স্ত্রীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রান্নাঘরের শিকল তুলিয়া দিয়া বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মোটর হইতে দুইটি তরুণী নামিলেন। দুইজনের বেশভূষা আধুনিক। জর্জ্জেট্ সিল্কের শাড়ি ঘুরাইয়া পরা, পায়ে জরির কাজ করা নাগরা জুতা। হাতে সোনার পাতে আট্‌কানো রিষ্ট্ ওয়াচ। গায়ে দু'চারখানি হাল্কা শোভন স্বর্ণালঙ্কার।

(২)

শান্তা তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া উপরের বসিবার ঘরে লইয়া গেল। মুন্সেফবাবুর স্ত্রীর নাম সুপ্রভা, অন্য মেয়েটি তাঁর বোন,

সুমনা। অবিবাহিতা। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া ছুটিতে দিদির কাছে বেড়াইতে আসিয়াছে। সুপ্রভাদেবী একটা উদ্দেশ্য লইয়া পসার প্রতিপত্তিহীন এই নতুন উকীলের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। এখানকার মহিলা সমিতির সম্পাদিকা পদে তাঁহাকে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছিল, এই নবগৌরবকে প্রাণপণে সার্থক করিয়া তুলিতে তাঁহার চেষ্টার আর অবধি ছিল না। বাড়ী বাড়া গিয়া মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহাদের সমিতির সভ্য হইবার জন্য সাধিয়া ফিরিতেছিলেন। এখানে আসিয়াই শান্তার সহিত ভদ্রতাসূচক দু'একটা কথা হইবার পরে তিনি বলিলেন, "আপনি বোধ করি লক্ষ্য করেচেন আজকাল মেয়েদের মধ্যে একটা জাগরণের সাড়া পড়েচে।"—

শান্তা চকিত হইয়া মুখ তুলিল। সে নারী জাগরণের কথা আদৌ ভাবে নাই। চিন্তিত হইয়া ভাবিতেছিল, ডাল চড়ান আছে, জল ঢালিয়া দিয়া আসিয়াছে, এতক্ষণে বুঝিবা পুড়িয়া ঝুড়িয়া একাকার হইয়া উঠিল। বলিল, "ওসব কথা/নিয়ে বড় একটা ভাববার অবসর পাইনে। সংসারের কাজে সারাদিনটা যে কোথা দিয়ে কেটে যায়। কিন্তু আপনারা মিনিট পাচ একটু বসুন, আমি আপনাদের জন্যে একটু চা' করে নিয়ে আসি।"

সুপ্রভা বাধা দিয়া বলিলেন, "না না কোন প্রয়োজন নেই। চা আমরা বাড়ী থেকে খেয়ে বেরিয়েচি। কিন্তু আপনি কথাটা

অমন করে উড়িয়ে দিলেন কেন বুঝতে পারলুম না। ঐযে সংসারের কাজের কথাটা উল্লেখ করলেন, ওরই বিরুদ্ধে আমি আপনাদের সচেতন করতে চাই। সারাদিন ধরে খাওয়ার চর্চ্চা আর খাওয়ানোর আয়োজন, ঐ কি মানুষের কাজ! ও যে পশুতেও ক'রে। সংসারে আরো কত ভাবনার বস্তু আছে, চিন্তা করে দেখবার সমস্যা রয়েচে—"

শান্তা ক্ষীণ হাসিয়া বলিল, "ভেবে দেখব। আপনাদের মত শিক্ষা বা অবসর কোনটাই আমাদের নাই। কিন্তু আজ আমার ভাগ্যিগুণে যদি আপনাদের পায়ের ধূলো পড়েচে, তবে একটু মিষ্টি-মুখ করেই যেতে হবে। না বল্লে আমি শুনবো না।"

আলমারি হইতে একটি ফটোর এলবাম্ বাহির করিয়া সুমুখে রাখিয়া শান্তা বলিল, "আপনারা ততক্ষণ এইটে দেখুন, আমি আসচি।"

নীচে আসিয়া রান্নাঘরের শিকল খুলিয়া দেখিল মুগের ডালের সমস্তটুকু জল পুড়িয়া ডাল হইতে একটা পোড়া দুর্গন্ধ উঠিতেছে। এতটা জিনিষ নষ্ট হইল, আবার করিয়া রাঁধিতে হইবে, মনে করিয়া তাহার মনে ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। হাঁড়িটা নামাইয়া দিয়া সে চায়ের কেট্‌লি বসাইয়া দিল। ট্রের উপর পেয়ালা প্রভৃতি গুছাইয়া লইয়া দুখানি রেকাবিতে খাবার সাজাইতে সাজাইতে তাহার হাসি পাইতেছিল, হায়রে যাহার মন এতক্ষণ অবধি একান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল রান্নাঘরে সামান্য একটু ডাল পুড়িয়া গেল কিনা, তাহারই

উপর, সে কিনা আবার ভাবিবে মানব জাতির সহস্রবিধ সমস্যার কথা। মেয়েরা জাগিয়াছে কি না, এবং জাগিয়া থাকিলে সে জাগার পরিমাণ কতখানি এ সকল তথ্য নিরূপণ করিবে সে!

শোভা খাবারের রেকাবি দু'টি বহিয়া নিয়া গেল। চায়ের ট্রে-খানি হাতে লইয়া শান্তা দোতালার ঘরে আসিল।

সুপ্রভা এবং তাঁহার বোন সুমনা তখন গভীর মনোযোগের সহিত শান্তার দেওয়া এলবাম্‌খানির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। এলবাম্‌খানিতে কলিকাতার তোলা শান্তার নানা বয়সের নানাবিধ ফটো। প্রথম শিশুকালের হইতে সুরু করিয়া ফ্রক পরা বিনুনি ঝোলানো প্রগল্‌ভা চঞ্চলা বালিকা বয়সের কতরকমের ফটো। তার-পরে কিশোরীর লজ্জানত মুখের শ্রী, তারপরে বিবাহের সময়কার এবং পরবর্ত্তীকালের কয়েকখানি ফটো। তাহার সহিত দার্জ্জিলিং শিলং সিমলা মুসৌরি প্রভৃতি কয়েকটি রমণীয় স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ছবি। প্রত্যেকটি ফটো অত্যন্ত দক্ষতা এবং নিপুণতার সহিত তোলা।

সুমনা বলিল, "আচ্ছা এ সবই তো ক'লকাতার তোলা ছবি, আপনার বাপের বাড়ী কি তাহ'লে ক'লকাতায়?"

"হ্যাঁ।"

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া সুপ্রভা কহিল, "ফটোগুলো কোন্ দোকান থেকে তুলেচেন? লাইট আর শেডের এত চমৎকার মিল রয়েচে, বাস্তবিক ফটোগুলি দেখলে লোভ হয়। আমরা এতবার

ক'লকাতায় যাই, এতরকম ফটো তোলাই ঠিক এরকমটি হয় না। আচ্ছা এই যে একটি ছোট ছেলের ছবি রয়েচে, স্নানের টবে স্নান করচে, এটি কার?"

"আমার দিদির প্রথম ছেলের।"

"কে তুলেচেন? সত্যি এত চমৎকার হয়েচে!"

শান্তা স্মিতমুখে কহিল, "আমিই তুলেচি। এই এল্‌বাম্‌খানিতে যে ছবিগুলি দেখচেন সেগুলি কোন পেশাদার ফটোগ্রাফারের তোলা নয়। আমি আমার দাদার কাছে আগে ছবি তোলা শিখেছিলুম। তাঁর ফটো তোলবার সখ চিরদিনের। তিনিই তুলেচেন এর অধিকাংশ। আমার তোলাও কয়েকটি আছে।"

সুমনা বলিল, "আপনার বাপেরবাড়ী তাহলে খুব কালচার্ড বলতে হবে।"

শান্তার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। বলিল, "কেমন করে বলব। তাছাড়া বাপের বাড়ীতে আমি অনেক দিন যাই নাই। প্রায় বছর দশেক হবে। মনে হয় সে যেন আর এক যুগের কথা। আমার বাবা কলকাতার হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। আমার বিয়ের বছরেই তিনি মারা যান। আমার বড়দাদা ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তিনিও বাবার মৃত্যুর মাস ছয়েক আগে মারা যান। এখন আমার বাপের বাড়ী অন্ধকার। কিন্তু ছেলেবেলায় আমার বাবা আমাদের খুব যত্ন করে মানুষ করেছিলেন।"

সুমনা বলিল, "আমাকে মাপ করবেন এমনতরো প্রশ্ন করবার জন্যে, কিন্তু আমার জানতে ভারি লোভ হচ্ছে, আপনি নিশ্চয় অনেকদূর অবধি লেখাপড়া জানেন।"

"অনেক দূর জানিনে। আমি যখন বেথুনে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়তাম সেই সময়েই আমার বিয়ে হয়। পরীক্ষার তখনও মাস তিনেক দেরী ছিল। কথা ছিল বিয়ের পরেও পরীক্ষা দেব। নানা গোলযোগে হয়ে উঠল না।"

সুপ্রভা কহিল, "তবে আপনার মত শিক্ষিতাদের কাছ থেকেও যদি আমি মহিলা সমিতির বিষয়ে সাহায্য বা সহানুভূতি না পাই তাহ'লে বড় দুঃখের বিষয় হবে কিন্তু।"

শান্তা ধীর স্বরে প্রশ্ন করিল, "আপনাদের সমিতিতে কি ধরণের কাজ হয় ?"

উৎসাহিত হইয়া সুপ্রভা বলিতে সুরু করিল, "নানাধরণের কাজ হয়। এই ধরুন কোথাও বন্যা হো'ল, আমাদের সমিতিতে চাঁদা তুলে, চ্যারিটি পারফর্ম্মেন্স করে টাকা তোলা হ'লো। সেখানে পাঠালুম। খদ্দর প্রচারের কাজেও আমরা অনেক কিছু করেচি। প্রত্যেক শনিবারে আমাদের সমিতির অধিবেশন হয়,..."

সুপ্রভার হাসি হাসি মুখের দিকে চাহিয়া শান্তা অন্যমনস্ক হইয়া গেল। কি হইবে তাহার ও সকল তথ্যে ? কোথায় কোন্ সুদূর গ্রামে কাহারা বন্যায় কষ্ট পাইতেছে, কাহাদের ঘর বাড়ী বিপুল

জলস্রোতে ভাসিয়া গেল, কোন্ গ্রামের নিরন্ন চাষীর দল বস্ত্রবয়ন কাজে নিপুণ হইয়া দুঃখের কূল কিনারা খুঁজিয়া পাইল, এ সকল ব্যাপারে তাহার মনকে জাগাইয়া তুলিবে সে কেমন করিয়া ? তার নিজের জীবনের আকাশে মেঘ যে নিবন্ধ হইয়া ঘিরিয়া আসিল। রোজ সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় আর মনে হয়, আজ যদি তার স্বামীর একটা কেস জুটিয়া যায়, সুবৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্রে একটুখানি আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। আজিকার সংসার খরচটা চলিয়া যায়। সংসারের ছোট বড় হাজারটা কাজে ব্যাপৃত থাকিবার সময় হঠাৎ যদি বহির্ব্বাটী হইতে স্বামীর গলার আওয়াজ পায়, মনটা অকারণ আশার পুলকে দুলিয়া ওঠে। এখনই হয়তো অপ্রত্যাশিত কোন একটা শুভ-সংবাদ পাইবে। হয়তো একটা বড় কেস পাইয়াছেন, হয়তো······চমক ভাঙ্গিয়া যায় বাস্তবের রূঢ় আঘাতে। প্রকাশ আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, "হ্যাঁগো ধোবা আসবে কবে ? কাপড়গুলো যে বড্ড ময়লা হয়ে গেছে, আর পরে বার হওয়া যায় না।" কিংবা হয়তো অনুৎসুক কণ্ঠে বলে, "আজ আর বড় সুবিধা হলো না। রামবাবু একটা কেস পাঠাবেন বলেছিলেন, কই এখনো জনপ্রাণীর দেখা নাই।"

মনে পড়িয়া গেল শান্তার, রোজ সন্ধ্যায় তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যার দীপ দেখাইবার সময় গলায় আঁচল দিয়া সে প্রণাম করে, আর করজোড়ে আকুল মনে প্রার্থনা করে, হে ভগবান মুখ তুলে চাও। এমন

চুপচাপ করে যেন আর ওঁকে বসে থাকতে হয় না। কত উকীলে কতইনা পাচ্ছে, উনি দু'চার টাকা করেও অন্ততঃ পান। এমন ক্ষুদ্র বিষয়ে এত অসীম উৎকণ্ঠা লইয়া যাহার দিন কাটে সে কেমন করিয়া বৃহত্তর জগতের অভাব অভিযোগের কথা ভাবিবে !

শান্তা মৃদুকণ্ঠে কহিল, "দেখুন আপনাদের সমিতিতি নাম লেখাবার কথা বলচেন, কিন্তু আমার অবসর তেমন নেই। সংসারে একা মানুষ, নানাকাজ, হয়তো আপনাদের প্রত্যেক অধিবেশনে যেতে পারব না। তাছাড়া আপনার কাছে গোপন করে কি হবে, আমার নিজের সংসারের এত ভাবনা চিন্তা যে সে সব সামলিয়ে বাইরের বিষয় নিয়ে ভাবতে পারিনে।"

সুপ্রভা দেবী বিদায় নিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বলিলেন, "আপনার মত শিক্ষিতা মেয়ের কাছে এমন আপত্তি আশা করি নাই। যাই হো'ক আপনার অনিচ্ছা যখন এত প্রবল তখন আর আমি জিদ করব না। কিন্তু আপনি এত ভাবেন আর এটুকু ভাবতে পারলেন না, আজকের দিনে মেয়েদের কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ গৃহকে ছাড়িয়ে বহু বহুদূর ব্যাপ্ত হয়ে গেছে।...আচ্ছা নমস্কার। আসি।"

শান্তা আলো দেখাইয়া দিল। তাঁহারা নীচে নামিয়া আসিলেন। মোটরে ষ্টার্ট দিবার গর্জ্জন আরম্ভ হইল।

(৩)

রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিয়া শান্তা আলু পটলের একটা তরকারী চড়াইয়া দিল। আজ অনেক রাত্রি হইয়াছে, নতুন করিয়া রান্নার আর সময় নাই। একটা তরকারী আর খানকতক রুটি গড়িয়া নিতে পারিলেই রাত্রির প্রয়োজন মিটিবে। মোটরখানা গেট পার হইবামাত্র প্রকাশ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে একান্ত কৌতূহলী ও আগ্রহান্বিত হইয়া আসিয়া বলিল, "তারপরে, কি কি কথা হ'লো? এতক্ষণ ধরে কি গল্প করছিলে? খুব ভাব হয়ে গেল নিশ্চয়। অনেকক্ষণ ছিলেন, কি বললেন?"

ময়দার রুটি বেলিতে বেলিতে শান্তা নিস্পৃহ স্বরে উত্তর করিল, "কি একটা মহিলা সমিতি ওরা আরম্ভ করেচেন, আমাকে তারই সভ্য হবার জন্যে বলতে এসেছিলেন।"

"বেশতো, হওনা। চাঁদা আর কত লাগবে? বড়জোর মাসে একটা করে টাকা তা, তুমি বেশ উৎসাহ দেখিয়ে রাজী হ'লে ত?"

"না, আমি বললুম। আমার সময় নেই।"

প্রকাশ কঠিন স্বরে বলিল, "তোমার কাণ্ডজ্ঞান বলে একটা জিনিষ নেই। সময় নেই কেন? কি এত রাজকাজ কর শুনি? কোথায় ওঁদের সঙ্গে মেলামেশা করবে, ওঁদের খুসী করে চলবার চেষ্টা করবে তা নয় নিজের অহঙ্কারেই গেলে।"

শান্তা কোন জবাব না দিয়া এক মনে রুটি বেলিতে লাগিল। হায়রে তাহার অহঙ্কার, তাহার অভ্রভেদী অহঙ্কারের কোনখানে কোন সীমা নাই, এ জীবনে যাহা কিছু সাধ করিয়াছিল যাহা আশা করিয়াছিল সে সমস্তই তো ধূলায় লুটাইতেছে। কিন্তু তবুও মনের এক জায়গায় তাহার অহঙ্কারের অবধি নাই। সেখানে সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, নিজের বিচার বুদ্ধিতে যাহা ভালো বোধ হয় না তাহা কিছুতেই করিবে না। সেখানে তাহার জীবনের দুঃখ, দারিদ্র্য, হীনতা, অভাবগ্রস্ত সংসারের শতলক্ষ দাবী ভীড় করিয়া দাঁড়াইলেও কিছুই করিতে পারিবে না।

রুটি বেলিতে বেলিতে সে কহিল, "তোমাকে বাড়িয়ে বলে বা মিথ্যে করে বলে আমার কি লাভ বলো? সত্যি আমার সময় নেই। সংসারের কাজ তো তুমি চোখের উপরে দেখতেই পাচ্ছ। শোভাটার জন্যে মাষ্টার রাখতে পাইনে, তাকে এরই মধ্যে সময় করে নিয়ে খানিকটা করে পড়ান আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। কোথায় পাব সময় ওসব সভা সমিতিতে যাবার? কিন্তু তুমি অত ভাবচ কেন, চেষ্টা করো, মক্কেল আপনি জুটে যাবে। তার জন্যে তোমাকে মুন্সেফবাবুর খোসামুদি করতে হবে কেন?"

এক নিমেষে প্রকাশের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। মৃদুস্বরে সে বলিল, "না না, আমি তা বলিনি, তা বলিনি শান্তা। একটি সারাদিন চুপ করে বসে থাক, রাতদিন কাজ আর কাজ। এমন

র দু'দিনে হাঁফিয়ে উঠবে যে! তাই বলছিলুম, এঁদের সঙ্গে লাপ পরিচয় করে, সমিতি টমিতিতে যদি-ই বা গেলে ক্ষতি কি। হয় আমাদের একটু অসুবিধা হ'লো, তাই বলে আমার সুবিধের ন্য তোমার জীবনটা মাটি করতে হবে নাকি? শোভার পড়া, সে আমার কাছেও তো একটু আধটু বসলে পারে। ধর আমি ন কোর্ট থেকে এসে জলটল খেয়ে বসি, তখন—"

শান্তার রুটিবেলা হইয়া গিয়াছিল, হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া সে াসন পাতিয়া দিয়া বলিল, "বোস। আমি গরম গরম তৈরী করে দিই। শোভাটা গেল কোথা, সে শুদ্ধ এসে বসুক না।"

স্বামীর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া তাহার নিজেরও কম বেদনা বোধ হয় নাই। কাজ কর্ম্মের সুবিধার জন্যই যে তার স্বামী মুন্সেফবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে তাহার হৃদ্যতা স্থাপনের জন্য অত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই প্রচ্ছন্ন কথাটুকু সে খোঁচা মারিয়া দেখাইয়া দিতে গেলো কেন? কেবল তার দুঃখের কথাই সে অনবরত ভাবিতেছে, আর তার স্বামীর দুঃখটাই কি কম। দিনের পর দিন জীবিকার জন্য এই দারুণ যুদ্ধে তিনি নিজেই কি কম অবসন্ন হইয়াছেন।

স্নিগ্ধস্বরে সে কহিল, "আচ্ছা তুমি খেতে ব'সোনা। একে াজ বেশী কিছু নেই, তার উপর সমস্তই যদি জুড়িয়ে জল হয়ে যায় তবে আর কিছুই খেতে পারবে না। আচ্ছা, তুমি এত অধীর

হও কেন গো? দাঁড়াও, ওকালতীর পসার কি অত অল্প সময়ের মধ্যে হয়। তুমি আর কতদিনই বা বসেছ, তা'ছাড়া আজকাল সমস্ত রকম ব্যবসার বাজার কিরকম মন্দা, দাঁড়িয়েছে ব'লো দেখি—শুধু কেবল আমাদের দেশেই নয়, গোটা পৃথিবী জুড়ে —"

"তা সবই বুঝতে পারি, কিন্তু চিন্তাকে তো তাই বলে আটকে রাখতে পারিনে। এক এক সময় কিযে দুঃখ হয় তোমাকে ত বলে বোঝাতে পারিনে। শোভাটা এত বড় হ'লো, না দিতে পেরেছি তাকে স্কুলে না করতে পেরেছি তার পড়াশোনার কোন বন্দোবস্ত। ভাগ্যে ভগবান বেশি ছেলেপুলে দেন নাই। আর তোমার কথা····· সে তো তুমি নিজেই জান। তবে এইটুকু জানি আমাকে সকল অবস্থাতেই তুমি ক্ষমা করেচ, আর করবে।"

শান্তা বলিল, "আমার ভাগ্যকে আমি মন্দ বলিনে। টাকা পয়সার সুখ সবারই হয় না। তা নাই বা হ'লো, তোমার কাছে আমার আর কি কষ্ট রয়েচে ব'লো। তাছাড়া এরই মধ্যে তুমি অত নিরুৎসাহ হয়ে পড়েচ কেন, একদিন তোমার পসার খুব ভালোই হবে, এ আমি বলে দিলুম। তা তুমি যদি ব'লো ওঁদের সমিতিতে নাম লেখাতেই হবে সময় করে নিয়ে এক একদিন যাব।"

সেদিন সকাল বেলায় শান্তার মনটা বিশেষ ভালো ছিল। আজ কয়েকদিন হইতে এখানকার বিখ্যাত উকীল শিবপ্রসাদবাবুর সহকারী জুনিয়াররূপে প্রকাশ একটা কেসে কাজ করিতেছে। দাওয়ায় বসিয়া সে তরকারী কুটিতেছে আর কত কি যে স্বপ্নের জাল বুনিতেছে। হয়তো এই একটা মকদ্দমাতেই তাহার স্বামীর নাম খুলিয়া যাইবে, হয়তো ইহার পর একটা মকর্দ্দমার পর আর একটা মকদ্দমা আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইবে। না থাকিবে কোন ভাবনা উৎকণ্ঠা, না থাকিবে ভবিষ্যতের কোন দুশ্চিন্তা। শোভা আলনাতে কাপড় জামা গুছাইয়া রাখিতেছিল।

সস্নেহ নেত্রে একবার তাহার পানে চাহিয়া মা বলিলেন, "শোভা উপর থেকে বেতের সেলাইয়ের বাক্সটা পেড়ে নিয়ে আয়, আজ তোর ফ্রক দু'টো শেষ করব।"

"কখন করবে মা?"

"এই তো আমার কাজ শেষ হয়ে এ'ল, তারপরে তোর বাবা দশটার মধ্যেই খেয়ে দেয়ে কোর্ট চলে যাবেন। তখন আর কি করবার থাকবে?"

পাশের বাড়ী হইতে প্রতিবেশিনী একটি বধূ বেড়াইতে আসিল। বলিল, "দিদি আজ টকিতে ভালো ছবি আছে, যাবে তুমি দেখতে? ভারি সুন্দর। কাল আমার ভাই গিয়েছিল, সে এসে বলেছে।"

সহরের মোহ

শোভা নাচিয়া উঠিল, "হ্যাঁ মা চলো, আমি কক্ষনো দেখিনি মা।"

শান্তা উত্তর দিল, "আচ্ছা যদি সুবিধে করে উঠতে পারি তা'হ'লে বিকেলের দিকে ঝিয়ের হাতে খবর পাঠাব ভাই।"

"আচ্ছা, যাবেন দিদি নিশ্চয়। সন্ধ্যের দিকে তৈরী হয়ে থাকবেন। একসঙ্গেই যাব। এখন উঠি ভাই। আপনার উনি হয়তো এখনই খেয়ে কোর্টে বেরুবেন। আপনার কত কাজ হয়তো পড়ে আছে।"

শোভা নূতন ফ্রক পরিয়া মহা উৎসাহে তার মার সঙ্গে সিনেমা হলের দিকে চলিল। শুক্লপক্ষের কি একটা তিথি। সমস্ত পথটা জ্যোৎস্নার আলোকে অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছিল। সন্ধ্যার দিকে ভারি মধুর একটি হওয়া দিতেছে।

শান্তা অনেকদিন বাড়ীর বাহির হয় নাই। তাই হাঁটিয়া এই পথটা যাইতে তাহার খুব সুন্দর লাগিতেছে। নিজের দৈনন্দিন সংসারের রুটিনের বাইরে এই যে একটা কত বড় পৃথিবী সৌন্দর্য্যে এবং বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া আছে সে কথাটা সে পুলকিত হইয়া বারংবার স্মরণ করিল। ছবির পর্দ্দায় সেদিন যে ছবিটি ছিল সেটির করুণ ঝঙ্কারও শান্তার মনের সুরের সহিত এক হইয়া মিশিয়া যাইতেছিল। ছবিটির গল্পখানি ছিল এইরূপ, ভাই বোন একসঙ্গে মানুষ হইয়াছিল। একরকম করিয়া আদর ও শাসন পাইয়াছিল।

শৈশব এবং কিশোরকাল দু'জনের প্রায় একই রকমে কাটিয়া গেল। ভাই ছেলেদের হাইস্কুলে পড়িত, বোন বেণী দুলাইয়া নাগরাজুতা পায়ে দিয়া মেয়েদের হাইস্কুলের বাসে গিয়া উঠিত।

তারপরে বোনটির বিবাহ হইয়া গেল। ছেলেটি হাইস্কুলের সীমানা ডিঙ্গাইয়া কলেজে ঢুকিল এবং মেয়েটি নবরক্তাম্বরে ঘন ঘন চক্ষু মুছিতে মুছিতে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল। এইখান হইতে আরম্ভ হইল তাহাদের জীবনের বিচ্ছেদ।

তারপরে ছবির পদ্দায় উঠিল, মেয়েটী শৈশবের মধুর স্মৃতি সমাচ্ছন্ন বাসগৃহতল পরিত্যাগ করিয়া এক অজানা সংসারে ঢুকিল। সেখানে প্রতিপদে কত ভয়, কত সঙ্কোচ, কত কৃত্রিম শাসন। ছেলেটা এদিকে কলেজের পড়া পড়িতে পড়িতে আরও উচ্চাভিলাষী হইয়া উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষের জন্য ইউরোপ চলিয়া গেল। সেখানে জ্ঞানের সাধনায় সে যখন তন্ময়, তখন এদিকে বোনটী সংসারের মিথ্যা আচারের বেড়ীতে শতপাক বন্ধনে জড়াইয়া পড়িতেছিল। তার শাশুড়ীর শুচিবাই ছিল, বৌকে রোজ তিনবার করিয়া স্নান করিতে হইত, বাসনের কোথাও এতটুকু কালি থাকিলে শত সহস্রবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেটুকুকে আবিষ্কার করিতে হইত।

স্বামী শিক্ষিত, কিন্তু এই পরিবারের যুক্তিহীন শুচিবাইয়ের ছোঁয়াচ তিনিও হয়তো উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছেন। পাঁজি না দেখিয়া কখনো চায়ে আদা খান না। কুষ্ঠির কোন্ দশার ফলে

তাঁর কখন কি হইবে সর্ব্বদাই এই সকল বিচার লইয়া ব্যস্ত থাকেন। একটা বিরাট তামসিক জড়তার মাঝে আচ্ছন্নের মত মেয়েটির দি কাটিয়া যাইতেছে। তার গতজীবনের স্মৃতি মাঝে মাঝে তাহাকে উদ্বেলিত করিয়া তোলে। কোথায় কত আলো কত সহজ সরল আনন্দের নির্ঝর স্রোতে যেন সে অবাধ স্নান করিতেছিল, হঠাৎ একটা যুক্তিহীন নামহীন অন্ধকারের শৃঙ্খলে সে বাঁধা পড়িয়াছে ছবির পর্দ্দায় দৃশ্যের পর দৃশ্য ফুটিয়া উঠিতেছিল।

বিকাল বেলায় ঝি একরাশ বাসন মাজিয়া আসিয়াছে, শাশুড়ী উঁচু দাওয়ার উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া আছেন, বৌমার উপর ভার দেওয়া আছে, সে এক একখানি করিয়া গেলাস, বাটি, থাল শাশুড়ীর চোখের সুমুখে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখাইতেছে। তিনি বলিতেছেন, "ও বৌমা ঐযে ঐখানটায় কালি!" অমনি সেই কাল্পনিক স্থানে বধূকে তাড়াতাড়ি বালু দিয়া মাজিয়া পরিষ্কার করিতে হইতেছে।

এমন সময়ে স্বামী দূর হইতে একটুখানি শ্লেষ করিয়া বলিলেন, "ওগো তোমাকে বলতে মনে ছিল না, কাল থেকে তোমার নামে একখানা চিঠি এসে আমার পকেটে পকেটেই ঘুরছে। তা'ও আবার যে সে চিঠি নয়, বিলেতী ডাকের চিঠি।"

মা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বৌ মানুষের নামে আবার মগের মুল্লুক থেকে চিঠি আসে কেন, সেখানে রয়েছে কে, ওসব ফিরিঙ্গি-

দ আমাদের সংসারে চলবে না। তা বাপু আমি আগের থেকে দ রাখচি।"

ছেলে একটুখানি উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিল, "কেন বৌয়ের যে ঐ সাত সমুদ্দূর তেরোনদী পারের মগের মুল্লুকে যেয়ে কত গুইনা করচেন। চিঠি আর আসবে কোথা থেকে, ওঁর কাছ কেই এসেচে।"

ইলা, বৌটীর নাম,—ইলার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তদিন সে তার প্রবাসী ভাইয়ের কুশল পায় নাই। কালও সারা-রাত্রি তার ভালো করিয়া ঘুম হয় নাই, দাদা কেমন আছেন, আগে ফি-ডাকেই তাঁর চিঠি আসিত, আজকাল কতদিন আর আসে নাই। অথচ কাল হইতে চিঠিখানি আসিয়া স্বামীর পকেটে ঘুরিতেছে, দিবার আর তাঁহার অবসর হয় নাই। সে দ্রুত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনীতকণ্ঠে কহিল, "মা যদি কিছুক্ষণের জন্য অনুমতি করেন তবে আমি একবার চিঠিখানি দেখে আসিগে। বহুদিন দাদার চিঠি পাই নাই। এই বাসনগুলোয় খুব সম্ভব আর কালীর দাগ নেই। যদিই থাকে, আমি এখনই ফিরে এসে মেজে ফেলচি।"

মা কটুকণ্ঠে বলিলেন, "আজকালকার বেহায়া মেয়েগুলোকে ভালো মতে শিক্ষাদেবার ব্যবস্থা করতে হয়। সোয়ামী এসে কি খবর দিলেন, আর বৌ অমনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটলেন। কিন্তু দেখ বাছা, এখনই যদি ঐ বিলেতের চিঠি নাকি ওসব ছোঁবে

তা'হ'লে কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে শুদ্ধ হ'য়ে তবে আ
নীচে এস। খ্রীষ্টানী চাল বাছা এইবারে ছাড়।"

সমস্ত গঞ্জনা নিঃশব্দে উপেক্ষা করিয়া ইলা খানি
করিয়া একান্তে তাহার শয়ন কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। দু'জ
মাঝখানে কত ব্যবধান। কেবল যে স্রোতসমাকুল গভীর স
তাই নয়। প্রতিদিনের জীবনধারার স্রোত তাদের দু'জন
কতদূরে আনিয়া ফেলিয়াছে। ইলার দাদা লিখিয়াছে, সে ল
য়ুনিভার্সিটির ডি, এস, সি ডিগ্রীর জন্য খুব খাটিয়া পড়াশো
করিতেছিল সেজন্য ইলাকে আর আগের মত ঘন ঘন পত্র দি
পারে নাই। যাক্ অনেক দিন পরে পরীক্ষার সব হাঙ্গামা চুকি
গেছে, আজ বাধাহীন অবকাশ। তারপরে তার চিঠিতে ওদেশে
কত খবর। মনুষ্যত্বের যে একটা বিরাট রূপ রহিয়াছে তাহাকে
খুলিয়া খুলিয়া কতদিক হইতে দেখাইয়াছে। একটা স্বাধীন দেশে
স্বাধীন নরনারীর জীবনযাত্রা সে যে কী বিস্ময়কর বস্তু, সত্যেশ
লিখিয়াছে, "ভাই ইলা এদেশে আসবার আগে তা কল্পনাও ক'রিনি।
সাহিত্যে, জ্ঞানের চর্চ্চায়, নির্ভীক জীবন যাপনে, এদেশের জীবন-
ধারা আমাকে মুগ্ধ করেচে। এরই সঙ্গে যখন আমাদের দেশের
তুলনা করি তখন বুঝতে পারি আমাদের দেশ কত পিছিয়ে আছে,
আমরা কি ইচ্ছা করে পিছিয়ে আছি ইলা, আমাদের পরাধীনতাই
আমাদের এমন করেচে। জীবনে অনেক কিছু কল্পনা করেছিলাম,

আশা আকাঙ্ক্ষার গতিটা ছিল সম্পূর্ণ অন্যদিকে। হঠাৎ এখানে এসে আমার চমক ভেঙ্গে গেছে। যাই কেননা/করি জীবনে, পরাধীনতার এই গ্লানি সারা অঙ্গে বহন করে আমরা কিছুই করতে পারবো না। তাই আজ আমার জীবনের সবচেয়ে বড়যুদ্ধ এরই সঙ্গে।—ইলা অনেকদিন তোর কোন খবর পাই নাই, আমি যখন ফিরে যাব, আমার কাজে নিশ্চয়ই তোর সাহায্য পাব।………”

ইলার চোখ দিয়া বিন্দু-বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। দাদা তুমি কিছুই জানোনা দাদা দেশের পরাধীনতার ছবি আমার চোখের সুমুখে কেমন করে ভেসে উঠাবে দাদা? অতবড় কল্পনা আমি কোথায় পাব? আমার নিজের জীবন যে অন্ধকারের অতলতায় ডুবে যেতে বসেচে। তুমি দেশ জোড়া পরাধীনতার বিরাট রূপ ধ্যানে দেখতে পেয়েচ, আর আমাদের মত মেয়েদের অনন্ত পরাধীনতা, প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্ত্তে শতসহস্র তুচ্ছ আচার, মিথ্যা সংস্কার, মূঢ়বুদ্ধির আনুগত্য স্বীকার একি তোমরা চোখে দেখতে পাওনা? এর থেকে আমাদের/মুক্তির আশা কোথায়?/ এ জীবনে তো আর মুক্তি মিলিবে না। মুক্তির চেষ্টা মাত্র করতে গেলে গুরুজনের মনে প্রিয়জনের মনে ব্যথা দিতে হবে।………

শান্তা মুগ্ধ হইয়া নিবিষ্ট চিত্তে দেখিতেছিল। ছবি শেষ হইয়া গেল। বাজনা বাজিতে লাগিল, আলো জ্বলিয়া উঠিল। শোভা ঘুমাইয়া গিয়াছিল। তাহাকে উঠাইয়া দিয়া তাহার অলেষ্টারের বোতাম আঁটিয়া দিতে দিতে বলিল, "শেষ হয়ে গেছে, এইবারে বাড়ী চ'ল।"

রাস্তায় আসিতে তারাভরা আকাশের দিকে চাহিয়া শান্তার মনে হইল, 'কী আশ্চর্য্য! আজিকার এই ছবির সঙ্গে তাহারই নিজের জীবনের ছবির কোথায় যেন অত্যন্ত নিগূঢ় মিল রহিয়াছে। সত্যইতো তার জীবনের প্রত্যেকদিনের ব্যর্থতা, প্রত্যেকদিনের দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ, ইহাতেই যে মনের সমস্ত আলো নিভিয়া যাইতেছে, সমস্ত উৎসাহ ব্যয়িত হইয়া পড়িতেছে। বৃহৎ ভারতবর্ষের বৃহত্তর মুক্তির কথা কল্পনা করিবার মত মনের দীপ্তি তার কোথায়? কোন কিছুতেই প্রগাঢ় উৎসাহ খুঁজিয়া পায় না। এই তো সেদিন সুপ্রভাদেবী মহিলা সমিতির অশেষবিধ কল্যাণকর কার্য্য-তালিকার কথা বলিয়া তাহাকে যোগ দিবার জন্য কত অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মন তার কোথায়? কেন এই অসম্ভব অসাড়তা, এই নিশ্চেষ্টতা সেই জন্যই বোধকরি বাংলার কোন একটা স্বদেশ-হিতকর অনুষ্ঠান সফল হইতে পায়না সফল হইবে কেমন করিয়া,

কিশোর তরুণ যুবকেরা জীবন সংগ্রামের তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত। এমনই শের অবস্থা যে দেশের ছেলেরা পাঁচ বছর বয়স হইতে পঁচিশ ব্বিশ বছর বয়স অবধি অবিশ্রান্ত পড়া মুখস্থ করিয়া অবশেষে শাহাবার মত জীবনের আসল রঙ্গস্থলে দাঁড়াইয়া দেখে সকল ন্ধ। কোনদিকে পথ খোলা নাই। রুদ্ধ কবাটের সুমুখে হাজার গেথা মুখ ঠুকিয়া রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হইলেও কিছু হইতেছে না। এই তো আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। সমস্ত জাতির যে ববাট যে শক্তিকে কেবল মাত্র কোন মতে দুবেলা দুমুঠো খাইবার থপরিবার ভাবনাতে "অহরহঃ এমনই নাস্তানাবুদ হইতে হইতেছে যে সাধ্য কি তাহাদের আর কোন বড় কথা ভাবিবার, আর কোন বড় প্রচেষ্টায় সমস্ত মন প্রাণ লইয়া যোগ দিবার। /

পাশ দিয়া একটা সিডান্ বডি মোটরকার মৃদু নিঃশব্দ গতিতে পার হইয়া গেল। রাস্তার আলোয় দেখা গেল, একজন মহিলা ফারকোটে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া বায়োস্কোপ হ'লের দিকে যাইতেছেন। সম্ভবতঃ রাত্রি সাড়ে নয়টার শোতে সিনেমা দেখিবার জন্য। শান্তা সেইদিকে একবার চাহিয়া ভাবিল, 'আমার যদি অমনই কোন বড় গভর্ণমেণ্ট অফিসার কিংবা বড়লোকের সঙ্গে বিবাহ হইত, আমি হয়তো দেশের আসল স্বরূপটা কি কোন কালেই টের পাইতাম না। লোকের উপর হুকুম জারি করিয়া এবং স্বচ্ছন্দ আরামের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া মনে মনে ভাবিতাম,

ভারতবর্ষের জীবনটাই এমনই। আসল রূপ এবং রঙ যে
তার পনের আনাই রহিয়া যাইত আমার অজানা। শত স
দেশবাসীর জীবনধারা আমাকে স্পর্শ করিত না। আমার স্বামী
দৈনন্দিন জীবনের বিপুল চেষ্টা এবং বৃহৎ অসাফল্য মর্ম্মে মর্
অনুভব করিয়াই না আমার দৃষ্টি গিয়াছে খুলিয়া !

তাহারা বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল। বাড়ী
চৌমাথার কাছে আসিয়া অপরাপর মেয়েদের কাছে বিদায় লইয়া
শান্তা ঘরে আসিয়া ঢুকিল। শোভা ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়াছিল
বাড়ীতে পৌঁছিয়াই বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল। রান্নাঘরের
সুমুখের দাওয়ায় একটা কেরোসিনের টেমি মিটি মিটি সামান্য আলো
এবং প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করিতেছিল। প্রকাশ একটা কম্বলের উপর
স্থির হইয়া বসিয়াছিল। শান্তা বিস্মিত হইয়া বলিল, "হাঁগো, তুমি
এখনও খাওনাই, আমি সমস্ত ঠিক করে, আসন পেতে, জল গড়িয়ে
অবধি ঢাকা দিয়ে রেখে গিয়েছিলুম।

প্রকাশ গভীর অন্যমনস্ক ছিল, হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "অত ব্যস্ত কেন, খাব বইকি, এই তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলুম। তারপর, কেমন লাগলো? শোভাটা বুঝি বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই ঘুমিয়ে গেছে?"

শান্তা একদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়াছিল, প্রকাশের কথাবার্ত্তার কেমন একটা দিশাহারা ভাব। কি একটা গভীর ক্লেশ

দ[illegible]কিয়া রাখিতে চাহিতেছে। তখনকার মত আর কিছু না দি[illegible]া শান্তা কাপড় ছাড়িয়া আসিয়া স্বামীকে খাওয়াইল, তারপরে [illegible] খাইয়া, রাত্রির অবশিষ্ট গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া উপরে শয়ন-[illegible] নিদ্রিতা কন্যাকে সন্তর্পণে শোয়াইয়া দিয়া কহিল, "হ্যাঁগো [illegible]ছু একটা হয়েছে, তুমি আমাকে গোপন করচ। কি হয়েছে খুলে [illegible] দেখি।"

প্রকাশ বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে মৃদুস্বরে বলিল, যে মোকর্দ্দমাটায় আমি জুনিয়ার হয়েছিলুম, সে কাজটা গেল শান্তা। এখনও মাসতিনেক ধরে কাজটা চলবে, আমি ভারি নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম। মনে করেছিলুম, এইবারে ভগবান বুঝি মুখ তুলে চাইলেন কিন্তু আজ হঠাৎ সিনিয়র উকীল আমাকে ডেকে বললে, দেখ গুপ্ত, অনেকদিন থেকে একটা কথা ব'লব ব'লব করে বলে উঠতে পারছিনে। তুমি যে কাজগুলো কর তাতে নানান জায়গায় নানারকম ভুল থেকে যায়। আইনের অনেক পয়েণ্ট অনেক সময় ছেড়ে যায়। বুঝতে পারচ তো, এটা একটা ভারি শক্ত মোকর্দ্দমা, এর হারজিতের উপর আমার সুনাম অনেক পরিমাণে নির্ভর করচে। তাই আমি বলি কি, এটা এখন ছেড়ে দাও। তোমার কথা অবশ্য আমার মনে থাকবে; ছোট-খাট কাজ পেলেই তোমাকে দেবার চেষ্টা করবো।" "আচ্ছা শান্তা তোমার কি মনে হয়, সত্যি আমি আইন ভালো জানিনে। না, তোমার কাছে লুকোবার কিছু নেই,

যেন গত জীবনের। শাস্তার কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল না। রাত্রির অন্ধকার পাতলা হইয়া আসিয়াছে, ভোরের আকাশে শুকতারার নিমেষহীন দীপ্তি চোখে পড়িতেছে। শাস্তার মনে পড়িল কয়েকদিন আগে একজন লেখকের লেখায় কোথায় পড়িয়াছিল, 'অতীত যেন আমাদের জীবনের অমরাবতী'। জীবনে যা কিছু খণ্ড খণ্ড ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বর্ত্তমানের মধ্যে দ্বিধাকৃত অতীতের স্মৃতিরূপে সে সমস্তই পরিপূর্ণ, মহিমোজ্জ্বল। বর্ত্তমানের একটা মাস মানে ত্রিশ দিন, কিন্তু অতীতে তাহাই একটী অখণ্ড পরিপূর্ণ মাস। নিজের জীবনের অতীতকালটাকেও এমনই একটী অমরাবতী বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল। বর্ত্তমানের দৈন্য এবং সমস্যায় পীড়িত কঠোর সংসার ভারের সঙ্গে তাহার যেন কোথাও যোগ নাই।

ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকের খোলা জানালাটা দিয়া সকাল বেলার আলো ঘরে আসিয়া পড়িল। শাস্তা উঠিয়া পড়িয়া নীচে নামিয়া গেল। খুব সকাল বেলায় উঠিতে না পারিলে গৃহস্থালীর সমস্ত কাজই যেন বিশৃঙ্খল হইয়া দাঁড়ায়। স্বামীও অনেক রাত অবধি জাগিয়াছেন মনে করিয়া সে তাঁহাকে উঠাইল না, শোভাও যেমন ঘুমাইতেছিল তেমনই ঘুমাইতে লাগিল। মনে করিল নীচে গিয়া আবশ্যক কা কর্ম্ম শেষ করিয়া চায়ের জল চড়াইয়া তাঁহাদের উঠাইয়া দিবে।

(৭)

উনুনে আঁচ দিয়া সে বারান্দায় ঝাঁট দিতেছে এমন সময়ে বাইরে একটা স্যাকরাগাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ হইল। এত সকাল বেলায় তাহাদের বাড়ীতে কে আসিল দেখিবার জন্য কৌতুহলী হইয়া রাস্তার ধারের জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিল, গাড়ীতে যিনি আসিয়াছেন তিনি নামিয়া গিয়াছেন। গাড়োয়ান তাঁহার তোরঙ্গ বিছানা প্রভৃতি নামাইয়া রাখিতেছে। পরমুহূর্ত্তে একজন সুশ্রী সুবেশ আটাশ উনত্রিশ/বছরের যুবক ঘরে ঢুকিল। আড়াল হইতে শান্তা তাহাকে চিনিতে পারিল তাহার খুড়তুতো দেওর প্রশান্ত কলিকাতায় থাকে। শান্তা যখন বাপের বাড়ীতে থাকিত তখন প্রায়ই সেখানে গল্প করিতে যাইত। আজ অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ নাই। ইহার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছে, আজকাল প্রশান্ত অতিমাত্রায় স্বদেশী হইয়া পড়িয়াছে। তবে মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত শান্ত অচঞ্চল দেশ-সেবা ব্রতই সে গ্রহণ করিয়াছে। মাস তিনেক আগে খবরের কাগজে পড়িয়াছিল, কি একটা কারণের জন্য তাহার মাস দুই জেল হইয়াছিল।

প্রশান্ত বলিল, "বৌদি', আমাকে চিনতে পারচেন না। আড়ালে গেলেন কেন ? হয়তো অবাক হয়ে ভাবচেন, বলা নেই কওয়া নেই এ কোথা থেকে এসে পড়ল, নয় ?"

"না ভাই তা ভাবি নাই। অনেকদিন তোমাকে দেখি নাই,

মনে করেছিলুম হয়তো আমার অপরিচিত কেউ এসেচেন। বোস। কোন্ ট্রেণে এ'লে? কলকাতা থেকেই আসচ তো? উনি উপরে ঘুমোচ্ছেন, দাঁড়াও, খবর দিয়ে উঠিয়ে আনিগে।"

"একজন উপরে ঘুমোচ্ছেন, তাঁকে কষ্ট দিয়ে উঠিয়ে আনবার দরকার কি, নিজেই উঠবেন। আপনি কি কাজ করছিলেন, করুন না আমাকে দেখে সঙ্কুচিত হচ্ছেন কেন?"

ইতিমধ্যে সিঁড়িতে চটিজুতার শব্দ করিতে করিতে প্রকাশ নীচে আসিলেন।

"আরে এ যে প্রশান্ত! কোথা থেকে, কখন?"

গতরাত্রির দারুণ দুশ্চিন্তা এবং মনোভারের পরে হঠাৎ প্রশান্তকে দেখিয়া প্রকাশ অতিমাত্রায় খুসী হইয়া উঠিলেন।

"তুই নিশ্চয় এই ভোরের এক্সপ্রেসে এসেছিস, রাত্রি জেগেছিস তাহ'লে, এক্সপ্রেসগুলোয় যা ভীড় হয়। শান্তা তুমি তাহ'লে চট্ করে চায়ের জল চড়িয়ে দাও।"

প্রশান্ত মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল. 'চা আমি খাইনে প্রকাশদা'।"

—"বলিস কিরে? বিংশ শতাব্দীর তাহ'লে তুই একজন আশ্চর্য্য বস্তু। কিন্তু কেন? হেতুটা কি? কোন একটা খেয়াল না মাসিকপত্রে চায়ের অপকারিতা বিষয়ে প্রবন্ধ পড়েচিস।"

"মোটেই না তুমি তো জান চা খেতে আমি কিরকম ভালোবাসতুম। কলকাতায় সেই মেসোমশায়ের বাড়ীতে শান্তা বৌদি'র

মা আমাদের চা পরিবেষণ করতে করতে হায়রান হয়ে পড়তেন।”

বিগতদিনের সুখ স্মৃতি মনে পড়ায় প্রকাশের একটা নিঃশ্বাস পড়িল। বলিল, “মনে পড়ে বইকি। কিন্তু তারপরে? তখন তুই কলেজে পড়তিস, পুরোদস্তুর কলেজি গন্ধ গায়ে। কথায় কথায় বই থেকে ভালো ভালো কথা তুলে দিতিস—”

“তারপরে দেখলুম কলেজের কেতাবে যা লেখে কলেজ থেকে বেরিয়ে আগাগোড়া সে সমস্ত ভুলে আবার উল্টোদিক থেকে শিখতে হয়।”

প্রকাশ ও শান্তা হাসিয়া উঠিল।

“ঠিক তাই। কিন্তু ভাই যখন এসেছিস, তখন দু’চারদিন থেকে যাস, কিন্তু চা খাওয়া কেন ছাড়লি? এমন জিনিষ সংসারে আর আছে রে? অমন বোকামি করতে গেলি কেন?”

“কেন, তুমি জানোনা আমাকে যে দু’মাসের জন্যে সরকারের আতিথ্য নিতে হ’য়েছিল। এই তো সেদিন জেল থেকে বেরিয়েচি। সেখানে যেয়ে প্রথম আবিষ্কার করলুম, চা খাওয়া অভ্যেস করে কি ভুলই না করেচি। ভয়ানক কষ্ট হ’তো। দিন রাত্রি আর কোন ভাবনা মাথায় স্থান পেতনা, কেবল ভাবতুম সকালে উঠে এক পেয়ালা চা না পাওয়া কত যন্ত্রণা। যাই হো’ক, এই একটা লাভ হ’লো সেই থেকে চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েচি।”

শান্তা এক পেয়ালা ধূমোত্থিত চা অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল,

"কিন্তু এখন তো আর জেলে নেই ঠাকুরপো, এখন খেতে আপত্তি কি রয়েচে ভাই?"

"নেই বটে। কিন্তু আমাদের সব সময়েই প্রস্তুত থাকতে হয়।"

শান্তার ভীত মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "ভয় পেলেন কেন বৌদি', আমার সমস্ত কথা আপনাদের ব'লব।

সদ্য ঘুম ভাঙ্গিয়া এমনই সময়ে শোভা আসিয়া দাঁড়াইল, ছোট ছেলে মেয়েরা হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া আসিয়া যখন দাঁড়ায়, তখন তাহাদের ভারি ভালো লাগে। শোভার ঈষৎ কুঞ্চিত চুল, বড় বড় নীল চোখে ঘুম ভাঙ্গা চাউনি, প্রশান্ত তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, "কী চমৎকার মেয়ে হয়েচে তোমার বৌদি'!" প্রসন্ন স্মিতহাস্যে একখানি রেকাবিতে কিছু জলখাবার আনিয়া প্রশান্তর সম্মুখে ধরিয়া দিয়া শান্তা বলিল, "চমৎকার মেয়েকে মাথায় চড়িয়ে দিও না, ওরই সুমুখে প্রশংসা করে। কিন্তু চা নাইবা খেলে, এই খাবারটুকু খেয়ে নাও।" প্রকাশ এবং শান্তা দুইজনেরই গতরাত্রির মনঃক্লেশ এই সুদর্শন প্রিয়ভাষী আত্মীয়টীকে অতিথিরূপে পাইয়া অনেকটা মিলাইয়া আসিল।

খাবার খাইতে খাইতে প্রশান্ত বলিতে লাগিল, "আমি কি কাজ নিয়েচি জানো বৌদি', পল্লী-সংগঠন আর পল্লীসেবার ভার। এর মধ্যে উত্তেজনা নেই, রোমাঞ্চ নেই, কিন্তু আসল কাজ আমাদের সুরু করতে হবে এইখান থেকেই। আমি যে এখন এসেচি তোমাদের

সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা করব বলেও বটে, আর তোমাদের এই ছোট সহরটীর আশে পাশে যে সব পাড়াগাঁ আছে, সেখানে যেয়ে তথ্য অনুসন্ধান করা, তাদের মধ্যে যেয়ে কাজ করা এই সবের জন্যেও।"

প্রকাশ অবিশ্বাসপূর্ণ হাসিয়া কহিল, "এই সব বাজে খেয়াল কবে থেকে জোটালে বল দেখি। কেন, তোমার বাবা মার্টিন কোম্পানীর বড়বাবু ছিলেন, অত নাম ডাক, ইচ্ছে করলেই তাঁকে মুরুব্বি ধরে একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারতে। কাজের কাজ হ'তো। তা নয় কোথা থেকে মাথায় কি খেয়াল চাপলো।" শান্তা স্বামীকে তাড়া দিয়া কহিল, "বেশ হয়েচে খেয়াল চেপেছে। সবাই যদি বিয়ে করে ছেলেপুলে নিয়ে মার্টিন কোম্পানীর বড়বাবু সেজে ব'সে থাকে, তাহ'লে সংসারে বড় কাজ কিছুই হয় না।"

প্রকাশ ম্লান হাসিল। আটবছর আগে এই ধরণের বড় বড় ভালো ভালো কথায় সে'ও পরম উৎসাহে যোগ দিত। কিন্তু আজ জীবনব্যাপী হতাশা লইয়া ক্ষীণদৃষ্টি অকালবৃদ্ধ প্রকাশ কেবল একটুখানি হাসা ছাড়া এই সব আদর্শবাদের বিষয়ে আর কিছুই বলিতে পারে না। তাহার কয়েকদিনের ফি সাতাশ টাকা ন'আনা, এটুকু তাহার শেষ সম্বল, এটুকুও আবার তাগাদা করিয়া আনাইতে হইবে। সেই তাগাদারই উদ্দেশ্যে সে বাহির হইয়া গেল। প্রশান্ত আসিয়াছে অনেকদিন পরে। তাহার কাছেও স্বতন্ত্রতঃ সংসারের

মান মর্য্যাদা বজায় রাখিতে হইবে। যা হো'ক, বাজার হইতে মাছ, তরকারী অল্প স্বল্প আনাইতে হইবে। টাকা চাই। এ কথাটা ছাড়া এই সকাল বেলাকার উদ্ভাসিত আলোতে আর কোন চিন্তাই তার মনে স্থান পাইবার অবসর নাই।

(৮)

শোভাকে পড়াইতে বসিয়া কুট্‌নো কুটিতে কুটিতে অদূরে উপবিষ্ট প্রশান্তকে উদ্দেশ করিয়া শান্তা প্রশ্ন করিল, "তোমাদের কিরকম কাজ ঠাকুরপো পাড়াগাঁয়ে ঘুরে বেড়িয়ে ?"

প্রশান্ত বলিল, "কাজ কি একটা বৌদি'। প্রথম কাজ চাষাদের বর্ত্তমান আয় যেটুকু যে কোন ভদ্র উপায়ে সেইটাকে আরও কিছু বাড়িয়ে তুলে তাদের জীবন যাত্রাটা সুগম করে তোলা। ধর, বছরের মধ্যে চাষের কাজ হয়ে গেলে বেশ খানিকটা তাদের অবসর থাকে। বছরের মধ্যে চার পাঁচ মাস তারা ব'সে থাকে, সেই সময়টা কোন কাজে লাগিয়ে তাদের অত্যন্ত অল্প আয়কে কিছু পরিমাণে বাড়ানো যায়। সেটা নানা উপায়ে হতে পারে। বেহারের অনেক পাড়াগাঁয়ে কেবলমাত্র ধানের একটা ফসলেই তারা খুসী থাকে না। ধান উঠে গেলে নানারকম রবিশস্য লাগিয়ে আরও কিছু ফসল উৎপন্ন করে লাভ করে। সেই উপায়টা বাংলাদেশের পল্লীতেও চালানো যায় কিনা অনুসন্ধান ক'রব, এই ইচ্ছা আমার

মনে হয়েচে। "সেইজন্যেই অনেকটা আমি এসেচি তোমাদের এই সব পশ্চিমের পল্লীগ্রামের চাষের প্রণালীটা নিজের চোখে দেখতে। তাছাড়া আরো একটা উপায় আছে চাষীদের আয় বাড়ানোর। ধর, তাদের বস্ত্র সম্বন্ধে স্বাবলম্বী করা যেতে পারে। এ বিষয়ে আজকালকার নানা মাসিকপত্রে, প্রবাসীতে মডার্ণ রিভিয়ুতে নিশ্চয়ই নানা প্রবন্ধ পড়েচ।"

শান্তা অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল, এখন প্রশান্তর কথা শেষ হইতে একটু চমকিত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, পড়েচি।"

তাহার পর কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ঠাকুরপো একটা অনুরোধ করবো, যদি কিছু মনে না কর। যদি তোমার বিশেষ অসুবিধা না হয়, এ বিষয়ে আমাকে কিছু সাহায্য করতে হবে।"

"নিশ্চয়ই করবো, আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন।"

"আমি মনে করেচি আই, এ পরীক্ষাটা দেব, তুমি তো এম-এ-তে ফার্ষ্ট হয়ে অনার্স নিয়ে পাশ করেচ। আমাকে খানিকটা সাহায্য করতে পারবে না? সেকেণ্ড ইয়ারে পড়তে পড়তে বিয়ে হয়ে গেল, পরীক্ষা দেবার আর মাস তিনেক ছিল, কিন্তু সে অনেক-দিনের কথা। চর্চ্চা নেই, হয়তো সমস্তই ভুলে বসে আছি।"

প্রশান্ত অনুৎসুককণ্ঠে বলিল, "এই কথা! কিন্তু হঠাৎ আপনার ও ধরণের ঝোঁক মাথায় চাপলো কেন? আই-এ পাশ করে কি

রাজা হবেন ? ও য়ুনিভার্সিটির পড়ার উপর আমার খুব একটা শ্রদ্ধা নেই।”

“রাজা হতে আমি মোটেই চাইনে ভাই। কিন্তু তুমি যে দেশের কথা নিয়ে এত ভাব, এই কথাটা কি কখনো ভেবেচ, কেবল চাষীদের দুঃখ দূর করলে চলবে না, এই দেশেরই মধ্যস্থিত ভদ্র সন্তানদের দুঃখ দুর্গতি ওদের চেয়েও অনেক অনেক বেশি।”

“আপনার কথাটা খুব ভালো করে বুঝতে পারলুম না।”

“তোমাকে আমি সঙ্কোচ না করেই কথাটা বললুম। আমার পরিবারের আয় আমি কোন উপায়ে কিছু বাড়াতে চাই। ধর, আই-এ পাশ করে আমি কোন স্কুলে মেয়েদের শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিতে পারি।”

প্রশান্ত কিছুকাল নিঃশব্দে থাকিয়া কথাটার গুরুত্ব বুঝিল। বুঝিতে পারিল এই পরিবারে অর্থসঙ্কট নিশ্চয়ই খুব বেশি রকম কিছু দাঁড়াইয়াছে সে বাহির হইতে আসিয়া ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না। হয়তো অধিকাংশ আজকালকার উকীলের মত প্রকাশদা' তেমন সুবিধা কিছুই করিতে পারেন নাই। শান্তা বৌদি'র সঙ্গে প্রশান্তর যখন প্রথম আলাপ হয় তখন পিতৃগৃহের অবাধ প্রাচুর্য্যের মাঝে সংসার-জ্ঞানহীন তরুণীর রূপে তাঁহাকে দেখিয়াছিল। আর আজ অভাব অনটনের মাঝে দরিদ্রের গৃহলক্ষ্মী রূপে এই তেজস্বিনী নারীকে নূতন মহিমায় দেখিতে পাইল। সসম্ভ্রমে সে কহিল,

"আপনি যে আমাকে বিশ্বাস করে এ বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন সেজন্য আপনার উপর আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত রইলো না। কিন্তু সাময়িক-ভাবে পরিবারের আয় বাড়ানো নানাভাবে হতে পারে। ধরুন তাঁতে তোয়ালে, চাদর, সতরঞ্চি, নানা বস্ত্র বুনে, সেলাইয়ের কল, মোজার কল, নানারকম এমব্রয়েডারির কল এ সম্পর্কে ব্যবহার করে সেই সমস্ত প্রস্তুত বস্ত্র কোন একজন মধ্যবর্ত্তীর হাতে বাজারে বিক্রয়ের জন্য চালান দিয়ে। মনে করবেন না এ সমস্ত আমি নিছক কল্পনার বশবর্ত্তী হয়ে বলচি, কলকাতায় এইরকম কাজের জন্যে আমরা একটা প্রতিষ্ঠানের মত খুলেচি, সেখানে নানারকম কুটীর শিল্প বয়ন, শিল্প প্রভৃতি শেখান হয়। এইবারে গরমের ছুটির সময় প্রকাশদা'র যখন কোর্ট বন্ধ থাকবে আপনাদের নিমন্ত্রণ রইলো কয়েকদিনের জন্যে এই সব দেখে শুনে আসতে আমার বাড়ী যাবার। নিজে এসে ধরে নিয়ে যাব। ইতিমধ্যে আপনি যদি পড়াশোনার জন্য আমার সাহায্য চা'ন, আমার যতদূর সাধ্য করতে পারি।" শান্তা একটু ভাবিয়া কহিল, "হ্যাঁ, আপনি যতদিন থাকবেন রাত্রির দিকটায় আমাকে কিছুদিন দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন আজকাল কলকাতা য়ুনিভার্সিটিতে কেমন ধরণের প্রশ্নপত্র আসচে, কেমন ধরণের প্রিপারেশন (Preparation) করতে হয়। ইতিমধ্যে আমাকে কিছু করতে হবে। আপনি যে সব কাজ বললেন তা আমি জানিনে। কলে মোজা বুনতেও জানিনে, তাঁত চালাতেও জানিনে।—"

"—কিন্তু না জানলেও আপনার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষে জানা কিছুই শক্ত হবে না। আমি আপনাকে উপস্থিত একটা এমব্রয়েডারি করবার কল আর একটা টেলারিং (দর্জির ছাঁট কাট ইত্যাদি বিষয়ের) সম্বন্ধে বই দেব, ব্যবহার প্রণালী আপনাকে শিখিয়ে দিয়ে যাব। আপনি অবসর সময়ে আজকালকার হাল ফ্যাশানের কিছু মেয়েদের ব্লাউজ, ছোট ফ্রক পেটিকোট, সেমিজ ইত্যাদি তৈরী করে তাতে আপনার রুচি অনুযায়ী এমব্রয়েডারি করে রাখবেন। আমাদের প্রতিষ্ঠানের মধ্যবর্ত্তীতায় আমি তা কলকাতায় বিক্রয়ের বন্দোবস্ত কোরব। সেলাইয়ের কল নিশ্চয় আপনার আছে, মেসোমশায় কলকাতায় একটা আপনাকে কিনে দিয়েছিলেন দেখেছিলাম।" শান্তা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "হ্যাঁ আছে।" এতক্ষণ ভিতরের একটা আবেগে এই সমস্ত অত্যন্ত সঙ্কোচকর কথা সে বাহিরের একজন পুরুষের সহিত আলোচনা করিতেছিল, কিন্তু এখন লজ্জা আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিল। তরকারী কুটিয়া রাখার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছিল। বঁটিটা নামাইয়া রাখিয়া সে মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আপনি আমার কথা শুনে আমাকে অদ্ভুত একটা কিছু ভাবচেন না তো, মনে হয়তো করচেন এদের বাড়ীতে আসবামাত্র আরম্ভ হ'লো কাজের কথা।"

প্রশান্ত বলিল, "বৌদি', ওসব ভদ্রতার কথা রেখে দিন। আমার কাছে ওসব কেন? আপনি যে সাধারণ মেয়েদের মত দুঃখে সুখে

পড়েন নাই, এমন অবিচলিত ধৈর্য্যে নিজের শক্তিকে সংসারের রক্ষার কাজে নিয়োগ করচেন, এইটে আমাদের দেশের অনেক মেয়েকে যদি শেখাতে পারতেন।"

শান্তা রান্নাঘরে কাজ করিতে গেল। প্রশান্ত দুয়ারের কাছে একটা মোড়ায় বসিয়া কহিল, "আপনার রান্না বান্না এগারোটার মধ্যে কি শেষ হওয়া সম্ভব হবে?"

"নিশ্চয়। কিন্তু হঠাৎ একথা কেন?"

"খাওয়া দাওয়ার পরে আমি সাইকেলে বার হব। এখান থেকে ছ'মাইল দূরে বিহিপুর গ্রাম আছে, সেখানে যাব। সেখানে হয়তো দু'তিনদিন থাকতে হবে, তারপরে আবার ফিরে আসব। ফিরে এসে কয়েকদিন রেষ্ট নিয়ে আবার কাছাকাছি কোন একটা গ্রামে যাব।"

"আপনি তাহ'লে কয়েকদিন আর আসচেন না। আচ্ছা ঠাকুরপো, আপনার কি মনে হয় আমি যদি আমার স্বামীকে একান্ত দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই দেবার জন্যে কোন ভদ্র পরিবারের একটী মেয়েকে কিছুদিন গান বাজনা, সেলাই ইত্যাদি শেখাবার ভার নিই, সেটা অসমীচীন হবে?"

প্রশান্ত একটুখানি ভাবিয়া কহিল, "দেখুন বৌদি' এ সম্বন্ধে বাইরে থেকে হঠাৎ কিছু বলা শক্ত। আপনার স্বামীর মনে এতে আঘাত লাগবে কিনা বলতে পারিনে। আমার কিন্তু একটা কথা মনে

হয় জানেন, স্বামী জীবনের উন্নতির জন্যে যখন প্রাণপণ স্ট্রাগ্‌ল্ করেন তখন স্ত্রী তাকে আর্থিক দিক থেকে কিছু সাহায্য করতে পারলো কিনা শুধু এইটে খুব বড় কথা নয়। তার চেয়ে আরো বড় জিনিষ তাঁর কাছে আশা করার আছে।”

“সে কি জিনিষ?”

“সম্পূর্ণ নির্ভরতা। একজন যদি গভীরভাবে উপলব্ধি করে আমার উপর কেউ সমস্ত মনে প্রাণে নির্ভর করে রয়েচে, সেইটে ভিতরে ভিতরে তাকে অত্যন্ত জোর দেয়। এতে না হয় এমন কাজ নেই।”

“ঠাকুরপো, নির্ভর করতে আমিও জানি। কিন্তু অনেক ভেবে দেখলুম, চুপ করে বসে থাকা আর আমার চলবে না। ওঁকে অনর্থক ভাবনা চিন্তায় শরীর পাত করতে দিতেও পারবো না। তা ছাড়া কথাটা তুমি ভেবে দেখ, আমার প্রচুর অবসর রয়েচে। মেয়ে বড় হয়ে গেছে, সংসারে এই দুটী প্রাণীর রান্না বান্না হয়ে গেল, উনি কোর্টে বেরিয়ে গেলেন, তারপরে চার পাঁচ ঘণ্টা আর আমার কিছুই কাজ নেই। সেই সময়টা আমি যদি কোন কাজে লাগাতে পারি, ক্ষতি কি?”

“ক্ষতি কিছুই নেই। কিন্তু এখন আপনার সংসারে প্রয়োজন উপস্থিত হয়েচে বলে আপনি যা করচেন, চিরকাল যেন তা করবেন না। প্রয়োজন মিটে গেলেই আপনার প্রেমকে বহির্মুখী না করে

আবার আপনার সংসারে ঢেলে দেবেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনার বাইরে কর্ম্মক্ষেত্রে নামবার এ প্রয়োজন যেন শীঘ্রই একদিন মিটে যায়।"

ভাতের ফেন ঝরাইতে ঝরাইতে শান্তা একটুখানি হাসিয়া কহিল, "তবেই দেখ ভাই, তোমরা যতই কেননা শিক্ষিত আর উদারপন্থী হও, মেয়েদের একমাত্র ঘরে ছাড়া অপর কোথাও দেখতে পার না। দেখলেই তোমাদের চক্ষু টাটায়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবার প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে।"

প্রশান্তও হাসিয়া বলিল, "আপনি যা বলেচেন তা খুবই সত্যি। আমরা চাইনে যে, টাকার জন্তে আপনারা ঘর ছেড়ে বাইরের কর্ম্মক্ষেত্রে ছুটতে থাকুন। টাকার হয়তো খুবই প্রয়োজন রয়েচে, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি প্রয়োজন রয়েচে আমাদের আপনাদের প্রেমে। বাইরে তাকে ছড়িয়ে পড়তে দেব কেন? আমাদের ঘরে তাকে বাঁধব। কিন্তু থাক আর এসব কথা। আপনি যে সমস্তার কথা তুললেন, আমি যথাসাধ্য তাই নিয়ে ভাবব এবং আমাকে দিয়ে আপনার যতটুকু সাহায্য করা সম্ভব, যতদূর পারি তারই চেষ্টা ক'রব। উপস্থিত আপনি রান্না শেষ করুন, আমি শোভার সঙ্গে একটু গল্প করি। সে এত মনোযোগ দিয়ে পুঁথিপত্র নিয়ে কি পড়চে দেখি।"

প্রশান্ত অল্প সময়ের মধ্যেই ফুটফুটে মেয়েটীর সঙ্গে দিব্য ভাব

জমাইয়া লইয়াছে এমন সময়ে প্রকাশ একটা গামছায় বাঁধিয়া কিছু তরীতরকারী এবং শালপাতায় মোড়া মাছ লইয়া বাজার হইতে গৃহে ফিরিলেন।

প্রশান্ত তাহাদের বাড়ীতে অতিথি, তাহারই সম্মুখে স্বামীকে আপন হাতে বাজার আনিতে দেখিয়া শান্তা অপ্রতিভ হইয়া ব্যস্ত সুরে কহিল, "ওমা, দেখ দিকি কাণ্ড! তোমাকে নিজে বাজার যেতে কে বলেছিল? ঝিকে পাঠালেই তো পারতে। ও, ঝি বুঝি আজ আবার কাজে আসে নাই। তার অসুখ না কি হয়েচে।"

প্রশান্ত শোভাকে শ্লেটে একটা অঙ্ক কষিতে দিতেছিল, বলিল, "না না দাদা, আপনি বৌদি'র কথা শুনবেন না। নিজে দেখে শুনে মাছ তরকারী আনলে বাজারের সেরা জিনিষটা পাওয়া যায়। তবে আপনি অনায়াসে সাইকেলে করে যেতে পারতেন, সঙ্গে থাকত একটা বড়গোছের রুমাল, জিনিষপত্র তাইতেই ঝুলিয়ে আনতেন। কি বলছেন? আপনার সাইকেলটা পাঙ্ক্চারড্ হয়ে গেছে। তাহ'লে তো আপনার কোর্টে যাবারও অসুবিধা হবে। চলুন দেখি গিয়ে সারতে পারি কিনা। আমার কাছে সাইকেল সারবার সরঞ্জাম ও যন্ত্র টন্ত্র সব সময়েই থাকে। ঐ কাজই কিনা, সর্ব্বদাই সাইকেলে করে এখান ওখান যেতে হয়।"

ব্যাগ খুলিয়া আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি বাহির করিয়া প্রশান্ত সাইকেল সারানোয় মনোনিবেশ করিল। শান্তা মাছ কুটিতেছিল, প্রকাশ

সেখানে আসিয়া বলিল, "এই প্রশান্ত ছেলেটী বড্ড ভালো, নয় গো।
কেবল আমার ভাই বলেই বলচিনে, এমন সৎ আর এমন উদার
ছেলে বড় একটা দেখা যায় না। কতদিন পরে ওর সঙ্গে দেখা,
অথচ এমনই সহজভাবে আমাদের সংসারের সঙ্গে মিশে গেছে
যে, মনে হচ্ছে এইখানেই যেন প্রতিদিন থাকে।"—তাহার পর
একটুখানি ইতঃস্ততঃ করিয়া প্রকাশ জামার-পকেটে হাত দিয়া বলিল,
"এই উনিশটাকা ক'আনা রাখ। আমার ফিয়ের টাকাটা আজ
পাওয়া গেলনা। উকীলবাবু মফঃস্বলে বেরিয়েচেন, তিনি ফিরে না
এলে পাওয়া যাবে না।"

"—তাহ'লে এ টাকাটা কোথায় পেলে, ধার করলে না কি?"

"হ্যাঁ, না, ধার ঠিক নয়—"

শান্তা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল, "আমার কাছে
লুকোবার তোমার কি থাকতে পারে বুঝিনে—" হঠাৎ প্রকাশের
হাতের পানে নজর পড়িয়া যাওয়ায় বলিল, "তোমার হাতের আংটিটা
কি হ'লো? দেখচিনে যে, কোথায় ফেললে, খেয়াল করোনি বুঝি?
দেখ দেখি মুস্কিল—"

প্রকাশ কোন উত্তর না দিয়া স্থির হইয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া
রহিল। নিমেষের মধ্যেই সমস্ত ব্যাপারটা শান্তার বোধগম্য হইল।
দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে সে কহিল, "আমাকে একবারও না জানিয়ে কেন তুমি
আংটি বেচে টাকা আনতে গেলে?" জানো ওটা আমাদের বিয়ের

আংটি ছিল!" শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র এবং গাঢ় হইয়া আসিল। প্রকাশ অপ্রস্তুতের মত দাঁড়াইয়াছিল, আমতা আমতা করিয়া বলিতে লাগিল। "ঐ তো বড্ড ভুল হয়ে গেল। ওকথাটা আমি একেবারে ভুলেছিলুম যে ওটা আমাদের বিয়ের আংটি! আচ্ছা, আমি আবার ওটা নিয়ে আসব কালই—"বলিয়াই মনে পড়িয়া গেল কাল আবার আংটিটা আনিবার মত অর্থ তাহার নাই। বরঞ্চ ঐ আংটিটা বিক্রয় করিয়া সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থতেই তাহাকে সংসারের অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিতে হইয়াছে।

শান্তা স্বামীর দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল তাঁহার মনের অবস্থা। আপনাকে সামলাইয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমাকে আর ভাবতে হবে না। যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন তুমি চট্ করে স্নান করে নাও দেখি, কোর্টে যেতে হবে না। দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

প্রকাশ হাঁফ ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি স্ত্রীর সুমুখ হইতে পালাইয়া গেল। পরক্ষণেই একটা ষ্টিলের বাটি হাতে করিয়া আনিয়া রান্না ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া হাঁকিল, "ওগো একটু তেল দাওনা।"

তেল, সাবান, তোয়ালে ইত্যাদি স্নানের সর্ব্ববিধ সরঞ্জাম গুছাইয়া দিতে দিতে শান্তার দু'চোখ ভরিয়া জল আসিল। তাহার স্বামী যে কত বড় অসহায় অবস্থায় পড়িয়া দিশাহারার মত তাড়াতাড়ি আঙ্গুলের আংটি বিক্রয় করিতে গিয়াছেন সেইটা মনে মনে অনুভব

করিয়া তাহার মনের সঙ্কল্প ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইতে লাগিল। প্রকাশ গায়ে মাখা সাবানটী আস্তে আস্তে সরাইয়া রাখিয়া বলিল, "সাবান আর কেন, এ সব জিনিষ আর তো জুটবেনা। অভ্যেসটা এবারে ছাড়তে আরম্ভ করি।"

শান্তা সাবানখানি অগ্রসর করিয়া দিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "সাবান নইলে তোমার স্নান করে তৃপ্তি হয় না, এ কথা কি আমি জানিনে। তুমি আর অত হিসেবী হতে যেওনা, সাবান জুটবে কি না, সে আমার উপর দেখবার ভার রইল। তোমাকে সে ভাবনা আর আমি করতে দেব না।"

প্রকাশ মৃদুকণ্ঠে বলিল, "শান্তা আমার উপর রাগ কোরোনা। সকাল বেলায় উঠে দেখলুম, প্রশান্ত এসেছে। তাকে বুঝতে দেওয়া হবেনা আমাদের সাংসারিক অবস্থা। বাজার কিছু কিছু করে আনতেই হবে। মস্ত একটা ভরসার কথা ছিল, বাকী ফিয়ের টাকা ক'টা পাব। কিন্তু শুনলুম সিনিয়র উকীল মিঃ সিংহ দিন দশের জন্যে মফঃস্বলে গেছেন, তাঁর ফিরবার কোন স্থিরতা নেই। অথচ—"শান্তা বাধা দিয়া বলিল, "না, রাগ আমি একটুও করি নাই। তুমি ওসব বাজে ভাবনা রেখে শান্ত হয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে কোর্টে যাও দেখি। প্রশান্ত রয়েচে বলে তুমি একটও সঙ্কোচ কোরোনা।"

"এইমাত্র তুমি যা বলিলে ছেলেটী তার চেয়েও ভালো। সাধারণ

লোকের মাপ কাঠিতে এদের মাপতে যেওনা। দেশের কাজে এরা নিজের জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অর্থ প্রতিপত্তি সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়েচে। ওদের কাছে কৃত্রিম সভ্য হয়ে থাকবার কোন দরকারই নেই।"

প্রশান্ত সাইকেল সারার কাজ শেষ করিয়া হাতে এবং জামায় কালি ঝুলি লাগাইয়া আসিয়া বলিল, "দশটা বেজে গেছে, তুমি প্রকাশদা' একটু তাড়াতাড়ি করে নাও। আমাকেও সাবান মেখে স্নান সেরে নিয়ে এই কালিঝুলির দাগ গুলো উঠাতে হবে। তার পরে খেয়ে নিয়ে বার হব।"

"কেন, তোমার কোথাও যাবার তাড়া আছে নাকি প্রশান্ত?"

"হাঁ, সে কথা আমি তো বৌদি'কে বলেচি। আমাদের বেশিদিন বিশ্রাম করবার যো কি ভাই প্রকাশদা'। এখন খেয়ে উঠেই টো টো করে সাইকেল নিয়ে বার হতে হবে। আপনাদের মক্কেল চরানোর চেয়েও বিশ্রী কাজ—ফিরবো হয়তো পাঁচ সাত দিন পরে। তার পরে আরও এখানকার ছোট ছোট দু একটা গ্রামে যাব, খাওয়া শেষ হ'লে কলকাতায় ফিরে যাব। এবার পশ্চিমের পাড়াগাঁয়ে বেরিয়েচি, কতকগুলো জিনিষ সম্বন্ধে হাতে কলমে শিখতে চাই।"

দু'জনে একত্রে আহার করিয়া একই সঙ্গে সাইকেলে করিয়া বাহির হইয়া গেল। প্রকাশ গেল নিত্যকার মত আশায় বুক-বাঁধিয়া বারলাইব্রেরীতে গিয়া ধন্না দিয়া বসিতে এবং প্রশান্ত কোন

এক দুঃসাধ্য আদর্শের ব্রত গ্রহণ করিয়া, ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়াইতে ছুটিল রাস্তাহীন গ্রাম্য মেঠো আলের দুর্গম রাস্তায়।

সকাল বেলাকার দ্রুতলয়ের কাজকর্ম্মের মাঝে একটা ছেদ্ পড়িল। যে যাহার কাজে বাহির হইয়া গেছে, নিঃশব্দ কর্ম্মহীন মধ্যাহ্ন খররৌদ্রে ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। সকাল বেলায় শয্যাত্যাগ করিয়া এই এতটা বেলা অবধি একমুহূর্ত্ত থমকিয়া দাঁড়াইবার অবসর শান্তার হয় নাই। একটা ঝি ছিল ঠিকার মতন, তাহাকেও ছাড়াইয়া দিয়াছে, একলাহাতে সমস্ত করিতে হয়। তাই এতক্ষণ পরে অবসর পাইয়া নানা চিন্তা ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। আজ বাইরের অতিথির কাছে সম্মান রাখিবার জন্য সম্পূর্ণ উপায়হীন ভাবে প্রকাশ ভীতব্যাকুল হইয়া বিবাহের আংটি বিক্রয় করিয়া অর্থসংগ্রহ করিল, তারপরে আরও যে কোন উপায়ে টাকা আসিবে, সে কথা কল্পনা করিতে বিলম্ব হয় না। একটা আসন্ন সর্ব্বনাশের সুমুখে তলাইয়া যাইবার জন্য যেন সারা সংসার উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। কোন একটা সবল হাত যদি অবলম্বন দিয়া কিছুদিন ইহাকে ঠেকাইয়া রাখে তবে হয়তো সেই অবসরের মধ্যে আবার দুর্দ্দিন কাটিয়া যাইতেও পারে। হয়তো ধীরে ধীরে প্রকাশের পসার হইতে পারে। এতদিন হয় নাই বলিয়া যে চিরদিনই হইবে না, এমন কি কথা আছে? কখন কেমন করিয়া কোন্ সূত্রে যে ভাগ্যের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া যায় তাহাতো কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু সেইটুকু

অবকাশ দিতে হইলে শান্তাকে এখন দৃঢ় এবং অন্যমনা হইয়া সংসারতরণীর হাল চাপিয়া ধরিতে হইবে।

শোভার এবং নিজের খাওয়া শেষ হইয়া গেলে সে কাপড় ছাড়িয়া শোভাকেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিল, তারপরে দুয়ারে তালাবন্ধ করিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া একেবারে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

শোভা প্রশ্ন করিল, "মা কোথায় বেড়াতে যাবে?"

"ললিতবাবুর বাড়ী যাব। সেখানে তুই একবার গিয়েছিলি, নয় শোভা?"

ললিতবাবুর বাড়ীর স্মৃতি তখনও শোভার মন হইতে অপসারিত হইয়া যায় নাই, সে উৎসাহিত হইয়া বলিল, "মনে আছে মা। সেই যে যেখানে আমাকে বিস্কুট আর চকোলেট খেতে দিয়েছিল, আর ছেলেদের খেলার কলের ছোট্ট এয়ারোপ্লেন চালাতে দিয়েছিল। বেশ হবে মা তাদের বাড়ী গিয়ে। কেমন মস্তবড় ফুলের বাগান আছে প্রকাণ্ড।"

(৮)

যখন শান্তা ললিতবাবুর প্রকাণ্ড থামওয়ালা প্রাসাদতুল্য বাড়ীর গেটের কাছে পৌঁছিল, তখন বাগানের মালী ঝারি হাতে ফুলের

গাছের গোড়ায় গোড়ায় জল দিতেছে। দ্বিতলের কোন একটী ঘরের মুক্ত বাতায়নের সামনে একজন কিশোরী দাঁড়াইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিয়া শান্তাকে অভ্যর্থনা করিয়া উপরে লইয়া গেল।

"তোমার মা, কাকীমা সব কোথায় অশোকা?" শান্তা মেয়েটীকে প্রশ্ন করিল। "ওঁরা শুয়ে আছেন। চলুন যাই। দিদিমা তাঁর বোনের বাড়ীতে গেছেন বেড়াতে। সেই সকাল থেকে গেছেন, এখনই ফিরে আসবেন সম্ভবতঃ। তাঁকে আনতে গাড়ী গেছে।".

অশোকা প্রথমে তাহার কাকীমার ঘরে ঢুকিল। ধনীগৃহের অসংখ্য আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণে কক্ষখানি পরিপূর্ণ। মেঝেতে পঙ্কের কাজ করা। পালঙ্কের বিছানার উপর অশোকার কাকীমা শুইয়া একখানি বাংলা উপন্যাস পড়িতেছিলেন, বিছানায় তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন, "ওমা আপনি এসেচেন, আমাদের ভাগ্য। আপনি তো ভয়ানক ঘরকুনো, কোথাও বার হতেই চা'ননা। সেদিন মুন্সেফাবাবুর স্ত্রী আমাদের এখানে এসেছিলেন, বলছিলেন, আপনাকে বলেছিলেন সমিতিতে যাওয়ার কথা। আপনার মত যথার্থ শিক্ষিত মেয়েদেরই তো চাই এই সব কাজে। তা আপনি রাজী হ'ন নাই। ঘর ছেড়ে কোথাও যাওয়া আপনার তেমন পছন্দ হয় না।"

শান্তা ক্ষীণ হাসিল। হায়রে ইঁহারা ধনীর গৃহিণী, এঁরা তাঁর

কথা বুঝিবেন কেমন করিয়া। বিকাল পর্য্যন্ত পাখার তলায় ঘুমাইয়া সন্ধ্যার দিকে পাতা কাটিয়া চুল বাঁধিয়া সজ্জিতবেশে গাড়ীতে করিয়া একবার মহিলা সমিতিতে গিয়া দেশের পরম উপকার করিয়া আসিবেন। এসব সখ তাহার কেন। অশোকার কাকীমা সন্তোষিণী-দেবী রূপার ডিবা হইতে পান বাহির করিয়া শান্তাকে দিলেন, অশোকার দিকে চাহিয়া বলিলেন, দে তো দেখি মা এক গ্লাস খাবার জল। উঃ, এই উপন্যাসখানা পড়তে পড়তে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেছে টের পাই নাই। আজ আর ঘুমই হ'লোনা, দিনে একটু না ঘুমাতে পারলে আমার আবার এমন মাথা ধরে। তাই জন্তেই তোর কাকাকে পয় পয় করে বলি এনোনা বাপু এইসব উপন্যাস ক্লাবের লাইব্রেরী থেকে। আরম্ভ করলাম তো আর শেষ না করে উঠতে পারব না—" হঠাৎ শোভার দিকে দৃষ্টি পড়ায় বলিলেন, "ওমা, এই যে খুকী এসে একাটি বসে আছে, দে অশোকা ওকে আলমারী থেকে বিস্কুট আর লজেঞ্চুস বার করে। খেলনা নেবে খুকু? ওই বড় ডল পুতুলটা পেড়ে দে। হ্যাঁ, দেখুন ঐ সমিতিতে সেদিন গিয়েছিলুম। কতকগুলো করে ছাই-পাঁশ উল আর দুটো ক্রুশের কাঁটা সবাইকে গছিয়ে দিলেন মুন্সেফ গিন্নী। এই দিয়ে উলের মোজা, গেঞ্জি, সোয়েটার, ফ্রক এইসব একটা করে সবাই বুনে দেবে। তাই নিয়ে গিয়ে কলকাতায় বিক্রী করে যা লাভ হবে, গরীব দুঃখীদের সাহায্য করা হবে। ওসব কাজ ভাই

আমার আসেনা। তার চেয়ে যদি কিছু চাঁদা দিয়ে গরীব দুঃখীর সাহায্য করতে বল এক্ষুনি রাজী আছি। আমাকে উনি হাত খরচ বলেই যে মাসে মাসে পঁচিশ ত্রিশ করে গছিয়ে দেন। বলেন, কত সময় তোমাদের কত রকম টাকার দরকার হ'তে পারে আগের থেকে কি জানা যায়! তা অশোকা তুই আমাকে দেনা মা উদ্ধার করে ঐ রয়েচে তাকের উপর উল আর কাঁটাগুলো। যা হয় কিছু বুনে দিস।"

ঝি আসিয়া রূপার উপর মীনা করা ট্রেতে তিন গ্লাস সরবৎ আনিয়া ধরিল। বরফের কুচি দেওয়া, সুগন্ধী দলিত খর্ম্মুজা সংযুক্ত। অশোকার কাকীমা গেলাসে চুমুক দিয়া ঝিকে প্রশ্ন করিলেন, "খোকা উঠেছে!"

ঝি বলিল, "না।"

"তাহ'লে তুই আমার মাথার চুলগুলো নেড়ে চেড়ে একটু শুকিয়ে দে দেখি। ভিজে মাথা নিয়ে শুয়ে পড়েছিলুম, এখনই হয়তো একটা অসুখ বিসুখ হয়ে ব'সবে।

খানিক পরে একটা মোটরের শব্দ শোনা গেল।

"ঐযে, দিদিমা এসে পড়েচেন। যাই আমি দেখে আসি।" —অশোকা উঠিয়া চলিয়া গেল। কিছুকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া শান্তাকে তাহার দিদিমার কক্ষে লইয়া গেল। দিদিমার যথেষ্ট বয়স হইয়াছে। আধুনিক ধনী গৃহের সর্ব্বময়ী গৃহিনী হইলেও ধরণ ধারণে

সেকালের স্নিগ্ধতা ও আন্তরিকতাটুকু প্রভাতের শিশিরের মত এখনও তাঁহার কথায় বার্ত্তায় হাসিতে ফুটিয়া রহিয়াছে। ধনের রবিকরদীপ্তিতে এখনও এতটুকু শুষ্ক হইয়া যায় নাই। যেটা শান্তা অশোকার কাকীমা প্রভৃতির সহিত তুলনা করিয়া নিমেষে বুঝিতে পারিল।

গৃহিণী তাঁহার ঘরে শান্তাকে বসাইয়া সহাস্যে কহিলেন, "আজ না চাইতে না কইতে দেখা।"

শান্তা অল্প হাসিয়া বলিল, "ঘরের রাজ্যের কাজ সেরে যখন তখন কোথাও কি যেতে পারি না যাবার উপায়ই রয়েচে।"

অশোকার দিদিমার হাসিমুখ একটুখানি গম্ভীর হইল। বলিলেন, "তোমরাই তো সুখী মা। নিজের স্বামীর সেবা যত্ন নিজে করতে পাও, নিজের সংসারের সব কিছু নিজের নখদর্পণে। আমাদের মত এমন করে হাঁপিয়ে উঠতে হয়না।"

"কে সুখী কে অসুখী এ প্রশ্নটা বড় জটিল—" শান্তা কড়িকাঠের দিকে চাহিল, "সবাই মনে করে অপরের জীবনযাত্রার মাঝেই যত সুখ বোঝাই করা রয়েছে। নিজের সঙ্গে তুলনা করে হা হুতাশ করে। কিন্তু থাকগে এসব কথা, আপনাকে আজ একটা কথা জানিয়ে যাব বলে এসেছি। আপনি সেদিন আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, অশোকাকে যদি একটু করে গান বাজনা শেখাই। সময় নেই বলে তখন ইচ্ছা সত্ত্বেও আপনার অনুরোধ রাখতে পারি

নাই। এখন যদি বলেন চেষ্টা করেও খানিকটা সময় করে নিতে পারি। তা ছাড়া—”

গৃহিণী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন, “তুমি আমাকে একটা ভাবনার দায় থেকে বাঁচালে মা। জানইতো কি ভাবনায় পড়েছিলুম। আমরা হলুম সেকালের মেয়ে, কে জানে বাপু অতশত। বিয়ে তো আর এক জন্মের সম্বন্ধ নয়, বিধির বিধি। যে যার পতি ঠিক করাই আছে। কিন্তু আজকাল দেখি সবেরই বিধান উল্টে গেছে। অশোকার বর আবার মুখ ভার করে ব’লেন, আমার স্ত্রীকে পাঁচটা বন্ধু বান্ধবের সামনে বার করতে হ’বে, তা না জানে একটু আধটু গান বাজনা না জানে কিছু ইংরিজী। বাপের মতে তখন বিয়ে করেছিলি। নিজে দেখে-শুনে পরখ করে নিসনি কেন বাপু! তুমি যদি কয়েকটা মাস একটুখানি কষ্ট করে এই ভারটা নাও মা, তাহ’লে আমি তো বেচে যাই।”

অশোকা নিজেও এ খবর শুনিয়া অতি মাত্রায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার স্বামী সম্প্রতি অনেক দূব কোন একটা জেলায় বদলী হইয়া গেছেন। সেটা অত্যন্ত দূব বিদেশ; অস্বাস্থ্যকর সে জন্যও খানিকটা আর পিতৃগৃহে কিছুদিন থাকিয়া অসমাপ্ত শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করিয়া লইবে সে জন্যও তাহার স্বামী তাহাকে কিছুকাল এখানেই রাখিয়াছিলেন। অথচ কোন দিকেই কোন সুবিধা ঘটিয়া উঠিতেছেনা বলিয়া সে ভারি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিল। শান্তার

কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া সে হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি মাসীমা আপনি সময় করে উঠতে পারবেন ?"

অশোকাদের বাড়ী হইতে বিদায় হইয়া সে যখন আপন গৃহে আসিল তখন মন তাহার অবসাদে এবং শরীর ক্লান্তিতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। যে দুঃসাধ্য পণ সে বহুদিন হইতে করিতেছিল অথচ কাজে খাটাইতে সাহস হইতেছিলনা, আজ সেই দুরূহ কর্ত্তব্যভার চোখ কাণ বুজিয়া কোন রকম করিয়া সমাপন করিয়া আসিয়াছে। কঠিন কর্ম্ম শেষের পরে যে একটা ব্যাপ্ত অবসাদ আসে তাহাই তাহার মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া ধরিয়াছিল। কিন্তু মনের ভাব যাহাই হউক, ঘড়িতে তখন সাড়ে চারিটা বাজে। স্বামীর কাছারি হইতে ফিরিবার আর বড় বিলম্ব নাই।

কলের পুতুলের মত নিজের অভ্যস্ত কাজ সে করিয়া গেল। প্রকাশ কোন এক সময়ে কাছারি হইতে ফিরিয়া পিতলের রেকাবীতে পরেটা ও একটু আলুর তরকারী দিয়া জলযোগ সারিয়া বাহিরের ছোট ঘরখানায় লণ্ঠনের আলোতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মুন্সেফবাবুর বাড়ী হইতে চাহিয়া আনা খবরের কাগজটার উপর চোখ বুলাইয়া লইতে লাগিল।

শোভা কিছুক্ষণ তাহার ছেঁড়া ধারাপাত এবং ভাঙ্গা শ্লেট লইয়া আপন মনে পড়া শোনা সারিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। সমস্ত পৃথিবীর উপর আস্তে আস্তে রাত্রির নিকষ কালো যবনিকা পড়িল। নীল

সহরের মোহ

আকাশ অগণ্য নক্ষত্রালোকে দীপ্ত। শান্তাদের একফালি বারান্দায় দিনান্ত রম্য সন্ধ্যার বাতাস ধীরে বহিতে সুরু করিল। আকাশে চাঁদের আলো নাই। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার বিরাজ করিতেছে। সেইখানে নির্জ্জনে বসিয়া তাহার অকস্মাৎ মনে হইল সে মিথ্যাই নিজের জীবনের জালে এমন করিয়া জড়াইয়া পড়িয়াছে। এই ভাবনা, দুশ্চিন্তা উদ্বেগ এটাই সব নয়। এ সবকে ছাপাইয়াও ঐ তো রহিয়াছে কালো আকাশে অন্ধকারের বন্যা। তারার প্রশান্ত আলো। কিছুকাল সেখানে বসিয়া তাহার মনোভার অনেকটা কমিয়া আসিল। স্বামীর নিকট কথাটা কি ভাবে কেমন করিয়া পাড়িবে নিজের কল্পনায় নানা ভাবে তাহার মুসাবিদা করিতে লাগিল।

বিছানার মশারি ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিতে দিতে সে শুধাইল, "আচ্ছা যদি কোন উপায়ে গোটা চল্লিশেক টাকার একটা চাকরী পাও, ঘণ্টা দুই খাটুনি, তাহ'লে সুবিধা হয় না কি তোমার ?

প্রকাশ একটু আশ্চর্য্য হইয়া স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "সুবিধা নিশ্চয়ই খুব হয়। আরও অনেক কিছুতেই অনেক সুবিধে হয় কিন্তু তা দিচ্ছে কে ? মানুষের ইচ্ছা অনুসারেই কি সংসার চলে ? তোমার মত আমিও এককালে খুব কল্পনা করতুম, এই হ'লে এই হয়, অমুক জিনিষটা হ'লে খুব চমৎকার হয়। কিন্তু আজ-কাল আর অমন করে ভাবতে পারিনে। এত বেশি ঠকেছি যে কল্পনার উৎস শুকিয়ে গেছে।

শান্তা মৃদুস্বরে বলিল, এটা কিন্তু কল্পনা নয়। তোমাকে একদিন কথায় কথায় বলেছিলুম গভর্ণমেণ্ট প্লীডার সতীশবাবুর স্ত্রী আমাকে খুব ধরেছিলেন তাঁর নাতনীকে কিছুক্ষণ ধরে ইংরিজী আর গান শেখাতে। মেয়েটির বিয়ে হয়েছে হাল ফ্যাশানের এক ডিপুটির সঙ্গে অথচ স্ত্রীটি শিক্ষা দীক্ষায় স্বামীর পছন্দানুযায়ী হয় নাই। সেজন্য স্বামী খুঁত খুঁত করচেন। আজও ওঁদের বাড়ী বেড়াতে যাওয়ামাত্র আবার আমাকে ধরেচেন। মাসে টাকা চল্লিশেক করে দেবেন। আমি বলি মন্দ কি।

প্রকাশের নিকট হইতে কোন সাড়া শব্দ আসিল না। বহুক্ষণ উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া শান্তা বলিল, "কই চুপ করে রইলে যে বড়। বল তোমার মত কি ?"

"গরীবের সংসারে কোন মত নাই।"

"তুমি জান এই ধরণের কথায় আমার কত কষ্ট হয়।"

"তুমিও জান তুমি এইমাত্র যে প্রস্তাব তুললে তাতে রাজী হ'তে আমাকে কতখানি কষ্ট পেতে হয়। অথচ এ'ও জানি হয়তো নিজের গরজেই রাজী হ'তে হ'বে।"

"আমি কিন্তু তোমার কথা ঠিক ভালো করে বুঝতে পারচিনে। ধর এই সংসারের কত কষ্ট যাচ্ছে। ভেবে ভেবে তোমারও শরীর আধখানা। যদি তেমন পরিশ্রম না করে ভদ্র উপায়ে আমি বাইরে থেকে কিছু উপার্জ্জন করতে পারি তাতে ক্ষতি কি রয়েচে ? আর

তা'ও চিরকালের জন্যে নয়। যতদিন না একটা রাস্তা হয়, সাময়িক ভাবে মাত্র।"

"ও সমস্ত যুক্তি আমিও জানি শান্তা। কিন্তু পুরুষের মনের কথা তোমরাও ঠিক বুঝতে পারবে না। যাক ওসব তর্ক। তুমি যা বলছ তাতে রাজী হ'তেই হ'বে। কিন্তু রাত যথেষ্ট হ'ল এবার শুয়ে পড়। আবার তোমার সুরু হ'বে রাত্রি ভোর থেকে সেই স্যাকরা গাড়ীর ঘোড়ার খাটুনী।

প্রথম যেদিন শান্তা অশোকাদের বাড়ী পড়াইতে গেল সেদিন একই সঙ্গে লজ্জা গর্ব্ব এবং হতাশা মিশ্রিত একটা ক্ষোভ তাহাকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। স্বামীর জীবনযাত্রার দুরূহ সংগ্রামে সে কিছু সহায়তা করিতে পারিবে। কেবলমাত্র গৃহিণী নয় কিন্তু তাঁহার চিন্তা ভারের লাঘবকারিণী হইতে পারিবে।

তারপরেই মনে পড়িল আমাদের সমাজের সেই চিরন্তন সংস্কার। মেয়েমানুষের অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা যেন একটা অস্বাভাবিক বস্তু। তাহাতে সম্মান নাই, গ্লানি আছে। স্বামীর মুখেও যে একটা হর্ষ জ্যোতিঃ দেখিবে আশা করিয়াছিল তাহার বদলে কুণ্ঠিত, ম্লান, চেহারা। তবুও সে কাজে লাগিয়া গেল। কল্পনা লইয়া বিলাস করিবার মত মনের অবস্থা বা প্রবৃত্তি কোনটাই খুব অধিক পরিমাণে ছিলনা এখন।

অশোকার ঘরে প্রথন যেদিন তাহাকে গান শিখাইতে গেল সেদিন এমনই ধরণের নানা বিভিন্ন এবং বিচিত্র মনোভাবে তাহার মন ব্যথিত হইয়াছিল। শান্তাকে গালিচার উপর বসাইয়া অশোকা হর্ষভরা সুরে কহিল, "আপনি একটু ব'সুন, আমি চট করে গা ধুয়ে আসছি।"

একলা বসিয়া থাকিতে থাকিতে ঘরখানির চারিদিকে দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। টেবিলের উপরে অশোকার স্বামীর ছোট একটি ছবি রৌপ্যের কারুকার্য্যখচিত ফ্রেমে। দেওয়ালের গায়েও তাঁহার নানা ধরণের ফটো টাঙ্গান। গুটিকতক বই টেবিলে সাজান আছে, তাহাতেও অশোকার স্বামীর হাতের লেখা উপহার। কিছুকাল পরে অশোকা আসিল। শান্তা বলিল, "দেখ, তোমাকে গান শেখাতে এসেছি বলেই যেন একেবারে গম্ভীর হয়ে ছাত্রীর মতন থেকনা। যা যখন খুসী গল্প করবে। আমিও হয়তো তোমার কাছ থেকে অনেক কথা জেনে নেব।

অশোকা হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "আপনি এত জানেন, আপনি আবার আমার কাছে কি জেনে নেবেন? কিন্তু আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে। আমি যা মেয়ে, একেবারে, বাইরের অপরিচিত কোন লোকের কাছে গান বাজনা শিখতে হ'লে হয়তো শিখতেই পারতুম না। ভাগ্যে আপনাকে পেয়েছি। আপনি বাড়ীর লোকের মত, তা ছাড়া স্নেহ করেন। কোন সঙ্কোচ বা লজ্জা নেই।"

"আচ্ছা তুমি গান ভালোবাস খুব, নয় ?" শান্তা প্রশ্ন করিল।

"আমি ! না আমি ওসব ভাববার বড় একটা অবসর পাইনে। গান শিখবার খুব সখ বা ঝোঁক আমার নেই। কিন্তু উনি খুব ভালোবাসেন। বলেন, সমস্ত দিনের খাটুনীর পর সন্ধ্যেয় যখন বাড়ী ফিরব, তখন তুমি যদি গান শোনাতে পারতে, সমস্ত দিনের ক্লান্তি নিমিষে দূর হয়ে যেত। আমি যখন ওঁর ঐ সব কথা শুনি তখন আমার মনে ভারি একটা ব্যাকুলতা হয়। গান কেমন করে শিখব, শিখতে পারব কি না, এসব ভাবতে যেয়ে ভয় করে। কিন্তু খুব ইচ্ছা করে যদি সাধ্য থাকে কোন উপায়ে ওঁর ইচ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ করব।" মনের আবেগে হঠাৎ একসঙ্গে এত কথা বলিয়া ফেলিয়া অশোকা অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া পড়িল। চোখ নামাইয়া আরক্ত মুখে বসিয়া রহিল। তাহার মুখের উপর যে একটি সলজ্জ অপরূপ আভা পড়িল সেইদিকে তৃষিত নয়নে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে শান্তা হার্ম্মোনিয়মে মৃদু মৃদু বেলো দিতে দিতে কহিল, "আচ্ছা এবারে শেখাতে সুরু করি। গল্প করতে তোমার সঙ্গে লোভ হচ্ছে কিন্তু কেবল গল্প করলে চলবে না। একটা সোজা সুরের গান করচি, কয়েকবার শোন তারপরে আরম্ভ করবে।"

কিছুক্ষণ পরে অশোকা উঠিয়া এক গ্লাস সরবৎ কিছু ফল মিষ্ট লইয়া আসিল। শোভা বাগানে খেলা করিতেছিল তাহাকে ডাকিয়া বাড়ী ফিরিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

অশোকার সঙ্গে গল্প করিতে সত্যই তাহার লোভ হইতেছিল। প্রথম প্রেমের বিচিত্র অনুভূতি এই মেয়েটির কথায় বার্ত্তায় দৃষ্টিতে ভারি মধুর একটি ছায়া ফেলিয়াছিল,—তাহার সংস্পর্শে এই মধুর সরসতা শান্তার কর্ম্মকঠোর জীবনেও যেন একটুখানি সঞ্চারিত হইয়া পড়িতেছিল। বিশেষ করিয়া ভালো লাগিতেছিল এই মেয়েটির অনন্য-নির্ভর ভাবটুকু। শিক্ষায় বয়সে জ্ঞানে তাহার চেয়ে অশোকা অনেক ছোট। কিন্তু নিজের জীবনের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করিয়া এতখানি সমর্পণের ক্ষমতা সে নিজে কখনও অনুভব করে নাই।

বাড়ী ফিরিয়া অভ্যস্তছন্দে সময় কাটিতে লাগিল। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা অস্বস্তিকর অনুভব যেন ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রকাশ কথাবার্ত্তা একেবারে কমাইয়া দিয়াছে। তাহার ব্যবহারে অভিমান ও ক্ষোভ এবং তৎসহ যেন একটা অপ-রাধীর ভাব। সেদিন সকালে কাছারি যাইবার সার্ট খুঁজিতে আসিয়া আলমারী হইতে একটা সার্ট বাহির করিয়া প্রকাশ বলিল, "যদি বা অনেক কষ্টে একটা খুঁজে পাওয়া গেল, তার বোতাম নেই।"

শান্তা বলিল, "দাও, আমি লাগিয়ে দিচ্ছি এখনই।"

প্রকাশ তিক্তস্বরে কহিল, "তোমাকে সার্টের বোতাম পরাণোর ছোট কাজে সময় নষ্ট করতে হ'বে না।"

এ তিক্ততা যে কেন শান্তা তাহা ধরিতে পারে। সত্যই কি

শিক্ষিতাভিমানী মেয়েরা আর্থিক উপার্জ্জন দিয়া স্বামীকে সাহায্য করিতে গেলে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যেকার মধুরতাটুকু নষ্ট হইয়া যায়! ইহারই সহিত তুলনায় অশোকার সেই ভীরু মধুর স্বাতন্ত্র্যলেশহীন প্রেমের চিত্রটুকু ভারি উপভোগ্য মনে হয়। মনে হয় তাহার সঙ্গে গল্প করিয়া সমস্ত জানিয়া লয়। কিন্তু গল্প করিবার সময় কম মিলে। অশোকাদের বাড়ীর সকলে তাহার কাছ হইতে যাহা আশা করেন, সেটুকু তাহাকে যেমন করিয়া হো'ক ফুটাইয়া তুলিতেই হইবে।

এস্রাজে একটা সোজা সুর শিখাথতে শিখাইতে শান্তা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা অশোকা, তোমার স্বামী যদি গরীব হতেন খুব, তুমি কি করতে?"

"ওকথা ভাবিনি মাসীমা, তিনি যা তাই। এর চেয়ে অন্যরকম যে কিছু হ'তে পারতেন তা মনেও হয়নি। গরীব যদি হ'তেন, তাই সইতেম। গরীব ধরণে চলত আমাদের জীবন যাত্রা।"

শান্তা এইখানেই থামিতে পারিলনা। কি যেন একটা সে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া জানিতে চায়। আবার বলিল, "আচ্ছা এমন যদি. কখনো হ'তো, তোমাদের সংসার খরচ চলছেনা। ঝি নেই, চাকর নেই, রাঁধবার বামুন নেই, যতদূর সাধ্য কষ্ট করে রয়েচ, তবুও চলেনা। তা'হলে তুমি কি করতে?"

"আমি আর কি করতাম, ভগবান অবশ্যই একটা উপায় করে দিতেন। তাঁকেই জানাতুম অভিযোগ, প্রার্থনা করতাম।'

"আর নির্ভর করে থাকতে—"

"তা থাকতুম বইকি।"

"ভগবানের উপর আর তোমার স্বামীর উপর।"

"তাই। কিন্তু মাসীমা আপনি এত উল্টো পাল্টা প্রশ্ন করতেও ভালবাসেন। কি হ'লে কি হ'তো আর কি হ'লে কি হয়না, আপনার মত এত কল্পনা করতে আমরা কই পারিনে।"

শান্তা কিছু অন্যমনস্ক হইয়া কতকটা আত্মগতভাবে কহিল, "তাই হয়তো ঠিক অশোকা, তোমার মত যারা নির্ভর করে থাকতে জানে যারা আমার মত ছটফট করে ফেরেনা, তারাই হয়তো জেতে—"

"আপনার কথা অনেক সময় আমি কিছু বুঝতে পারিনে মাসীমা।"

"বুঝবার দরকার নেই। ও অন্য কথা। আচ্ছা এবারে তুমি এস্রাজে গৎটা বাজাও দেখি, যেটা শেখালুম।······এইতো বেশ হয়েছে। রমেনবাবু যখন এবারে আসবেন, কত খুসী হবেন।"

অশোকা সলজ্জভাবে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "জানেন ওঁকে আপনার কথা লিখেছিলাম। এত খুসী হয়েচেন। এই সহরেই ওঁর বদলী হয়ে আসবার কথা হচ্ছে, তা যদি হয় খুব ভালো হয়। আপনাকে অনেক দিনের মত কেমন কাছে পাই।"

শান্তা ঘড়ির দিকে চাহিয়া উঠিয়া পড়িল। প্রায় তিনটা বাজে।

রোজ এই সময়েই সে বাড়ী ফেরে। স্বামী কাছারি হইতে ফিরিবার অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক আগে। অশোকার কাছে বিদায় লইয়া শোভাকে সঙ্গে লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। মনের মধ্যে একটা সুর মধুর হইয়া বাজে অশোকার সহিত সংস্পর্শে। তাহার নিজের চরিত্রের মধ্যে তেজস্বিতা আছে, অসীম কর্ম্মক্ষমতা আছে; কিন্তু নাই একটা জিনিষ, অনন্যপরায়ণ নির্ভরতা। সেই জিনিষটার স্পর্শ সে যেন পায় অশোকার সংস্পর্শে। মনে হয়, এই মেয়েটি অনবরত বুদ্ধি খাটাইয়া উপায় উদ্ভাবন করিয়া হয়তো সংসারের চলার পথে সাহায্য করিতে না পারে কিন্তু সুখে দুঃখে এমন একটি পরম সহিষ্ণু অবিচল নির্ভরের ভাব আনিবে যাহাতে সমস্ত বোঝাই অবলীলাক্রমে বহন করা যায়।

বাড়ীতে পৌঁছিয়া দেখিল স্বামী কোর্ট হইতে তখনও ফেরেন নাই কিন্তু বাইরে একটা বাইসাইকেল দাঁড় করানো আছে, তাহাতে ষ্ট্র্যাপে বাঁধা প্রশান্তর ছোট সুটকেস এবং বিছানা। ভিতরের দিকের বারান্দাতে একটা বেতের চেয়ারে বসিয়া স্বয়ং প্রশান্ত। সে শান্তাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্বৰ্দ্ধনা করিয়া কহিল, "এইযে বৌদি'! দোর তালা বন্ধ, কন্যাসহ কোথায় অন্তর্দ্ধান করেছিলেন? দাদা গেছেন কোর্টে আর আপনিও গেছিলেন অফিসে?"

আঁচলের চাবি দিয়া তালা খুলিতে খুলিতে শান্তা বলিল, "তোমার ফিরতে দেরী হ'লো ঠাকুরপো। কিন্তু আমার এই অফিস যাওয়ার কথা আগেই তো তোমাকে জানিয়েছিলুম।"

"তা জানিয়েছিলেন বটে। কিন্তু ব্যাপারটা যে এত শ্রীহীন লাগবে তা আগে কল্পনাও করতে পারি নাই।"

শান্তা ষ্টোভ ধরাইয়া চায়ের জল চড়াইল। তাহার পরে কাপড় ছাড়িয়া আসিয়া আবশ্যকীয় গৃহ মার্জ্জনা এবং গৃহ পরিষ্কারে মনোযোগ দিল। তাহার হাতের কাজ লক্ষ্য করিয়া প্রশান্ত বলিয়া চলিল, "তা ছাড়া আপনার এত পরিশ্রম, বাইরে থেকে এসেই ঘরের সমস্ত কাজ আবার নিজের হাতে করা, এমন করলে দু'দিনেই ভেঙ্গে পড়বেন।"

"না ভেঙ্গে পড়বনা। কিন্তু ঠাকুরপো তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। তুমি এবারে কলকাতা যেয়ে একটি এম্‌ব্রয়েডারির কল আর কিছু সৌখীন কাপড় এবং পশমের সুতো আমাকে কিনে পাঠাবে। আমি নানারকম মাপ ও ডিজাইনের জামা তৈরী করে বলতো তোমাকে পাঠাব। তুমি বিক্রি করে লাভের টাকা থেকে তোমার কলের দাম শোধ করে নেবে। তারপরে শোধ হয়ে গেলে লাভটা আমাকে পাঠাবে।"

"অত সেলাই করবার সময় পাবেন কখন ?"

"সময় করে নিতেই হ'বে। আরো কিছু টাকার সংস্থান চাই। আমি একটা হিসেব তৈরী করেচি, তাতে খুব কম করে ধরলে গোটা বাটেক টাকা যদি আমি বাইরে থেকে আনতে পারি তাহ'লে আমার সংসারটা চালিয়ে দিতে পারব। ললিতবাবুদের বাড়ী থেকে গোটা

চল্লিশেক করে পাব। আর কুড়ি টাকা আমাকে সেলাই করে বা অন্য কিছু করে হো'ক জোগাড় করে নিতে হ'বে। অন্ততঃ বছর দুই যদি এভাবে চলে যায়, এর মধ্যে ওঁর প্র্যাক্‌টিস কিছু কিছু দাঁড়িয়ে যাবে, নয় ?"

তাহার ক্লান্ত মুখের দিকে চাহিয়া প্রশান্ত বলিল, "নিশ্চয় দাঁড়িয়ে যাবে। আমার মনে হয় তার চেয়ে আগেও দাঁড়িয়ে যেতে পারে। তবে আপনার খাটুনিটা খুব পড়বে। তা, যাই হো'ক, আমাকে যতটুকু সাহায্য করতে ব'লবেন আমি করব। কিন্তু আজ এসেই আমার এমন খাপছাড়া লাগল।"

"কিসের ?"

"এসে দেখলুম আপনার বাড়ীর দোর তালা বন্ধ। তারপরে মনে পড়ল, আপনার যেন কোথায় কোন মেয়েকে গান আর শেলাই শেখাবার চাকরি নেওয়ার কথা ছিল। তাই হয়তো নিয়েচেন। কিন্তু আমাদের বাংলা দেশের পরিবারের এ দৃশ্য মানায় না। স্বামী একদিকে কাজ করতে কাছারি কিংবা অফিসে বেরিয়ে গেছেন, স্ত্রী আর একদিকে বেরিয়ে গেছেন। ঘরের দরজায় তালা বন্ধ। তার চাবি দু'জনের কাছেই আছে। যে যখন ছুটি পান, ঘর খোলেন, একা শূন্য ঘরে ঢুকে কড়িকাঠ গণনা করেন। ইউরোপীয় সমাজে এমন দৃশ্য অনেক আছে। তাইতো সেখানে ঘর বলে কোন জিনিষ আমোল পেলেনা। অসংখ্য ক্লাব, অসংখ্য রেস্তোরা, অসংখ্য

আমোদের জায়গা কিন্তু আমাদের ঘর যেমন একীভূর্ত বস্তু একসঙ্গে আরামের শান্তির এবং কর্ম্মের কেন্দ্র তেমন জিনিষটি ওরা ক্রমশঃ হারাচ্ছে।”

শান্তা বলিল, “ও কেবল ইউরোপের দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছ কেন ভাই, ও সম্ভব হয়েছে আজকালকার যুগের ব্যবস্থার ফলে। জীবনযাত্রার জটিলতা আর খরচ অসম্ভব বেড়ে গেছে অথচ সেই খরচ চালাবার মত ক্ষমতা বজায় রাখা ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে পড়চে।”

প্রকাশ আসিয়া পড়িল। তাহাকে দেখিয়া শান্তা বলিল, “এইযে এয়েচ, ভালোই হয়েছে। ভাবছিলুম, চায়ের জল চড়িয়েছি এবারে এসে পড়লেই একসঙ্গে সবারই চা খাওয়া হয়।”

প্রশান্ত লক্ষ্য করিয়া দেখিল, এই কয়েকদিন আগে যাইবার সময় তাহার প্রকাশদা’র মুখে যে লাবণ্য যে তরুণ এবং সজীব ভাব দেখিয়া গিয়াছিল, ইহার মধ্যেই সে বস্তু অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে আছে একটা শুষ্কতা।

প্রকাশ বলিল, এইযে প্রশান্তও এসে পড়েচ দেখচি। আমি তাহ’লে ঠিক সময়ে এসেছি। না এলেও কোন ক্ষতি ছিলনা,। যদি তোমাদের চা হয়ে যেত তাহ’লে এই সামনের গলির মোড়ে চায়ের দোকান রয়েচে, বেশ চা বিক্রী হয়। তাই এক পেয়ালা আনিয়ে খেতাম।”

শান্তা অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, “কেন আমি কি তোমাকে এক

পেয়ালা চা আরেকবার তৈরী করে দিতে পারতুমনা? তারই জন্যে তোমাকে দোকানের নোঙ্‌রা চা খেতে হ'তো!"

প্রকাশ নিস্পৃহকণ্ঠে বলিল, "হয়তো পারতে, হয়তো দিতেও। কিন্তু তুমিও খেটে খুটে বাড়ী আসচ, তোমারও একটু বিশ্রামের দরকার।"

চা খাওয়া শেষ হইবামাত্র প্রকাশ উঠিয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা ক'রায় বলিল, কি কাজে তাহাকে বাহিরে যাইতে হইবে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন রাত্রি এগারোটা। প্রশান্ত সেই সবেমাত্র খাইয়া উঠিয়াছে। শোভা অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কেবল শান্তা অপেক্ষা করিয়াছিল। সে স্বামীকে দেখিয়া উঠিয়া ভাত বাড়িতে গেল। প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রি অবধি কি করছিলেন দাদা?"

প্রকাশ বলিল, "আমি যাঁর জুনিয়র উকীল ছিলুম তাঁরই বাড়ীতে তাঁর লাইব্রেরী ঘরে পড়াশোনা করছিলুম। প্রথমটায় আমার উপর চটেছিলেন, খুসী ছিলেননা। নানাজনে নানা কথা লাগাত। আর আমিও খোসামুদি বিদ্যায় পাকা ছিলাম না। এখন হালে পানি পেয়েছি। তাঁর ছোট ছেলে ম্যাট্রিকের টেষ্ট্ পরীক্ষায় প্রত্যেক বিষয়ে ফেল করেচে, আমি তাকেই পিটিয়ে পাশ করাবার ভার নিয়েচি। কলেজ জীবনে সংস্কৃত আর ইংরেজীতে ভয়ানক ষ্ট্রং ছিলাম। এখন সেইটে কাজ দিচ্ছে। তাই দেখলাম ছেলের বাবা আমার

উপর খুসী আছেন। ডেকে বল্লেন, প্রকাশ তুমি আমার লাইব্রেরীতে বসে পড়াশোনা ক'রো। আমি বরাবরই দেখচি তোমার বুদ্ধিটা খুবই তীক্ষ্ণ আর আরগুমেণ্ট্ করবার ক্ষমতাও অদ্ভুত তবে কিনা বার আজকাল ওভার ক্রাউডেড্ (over crowded)……"

প্রশান্ত হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, দাদা আগে খোসামোদ করতে পারতেননা, এখন কবে থেকে ও বিদ্যায় হাত পাকালেন…?"

"যখন থেকে শান্তার উপার্জ্জনের টাকায় সংসার চলছে।"

"চুপ চুপ, বৌদি' শুনতে পাবেন। রান্নাঘরে দুধ গরম করতে গেছেন। কিন্তু রান্নাঘরতো এখান থেকে বেশি দূর নয়। আচ্ছা এটা কি আপনার মনে এতই লেগেছে……"

প্রকাশ বাধা দিয়া বলিল, "ওসব কথা থাক প্রশান্ত। অন্য কথা বল। গ্রামে কি দেখে এলে?"

দেখে এলাম নানা দুঃখ দারিদ্র্যের চিহ্ন। এমন অনেক কষ্ট যা মানুষকে তিলে তিলে মনুষ্যত্বের ধাপ থেকে নামিয়ে আনে। সমস্ত গ্রামে একটা ইস্কুল নেই, একটা ডাক্তারখানা নেই—" প্রকাশ নিস্পৃহ কণ্ঠে কহিল, "না থাক, তবু ওরা সুখে আছে। প্রশান্ত তোমরা মনে কর পাড়াগাঁয়ে একটা ইস্কুল আর একটা ডাক্তারখানা না থাকলেই দুঃখের আর অবধি থাকেনা। দুঃখটা যে অন্যধার থেকে যেয়েও পৌছতে পারে সে কল্পনা করতে পারনা।"

সহরের মোহ

"আপনি আজ উল্টোপাল্টা কথা বলচেন কেন, বুঝতে পারচিনে। কোন কারণে আপনার মন চঞ্চল।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রকাশ বলিল, "তা হ'বে। তবু তোমাদের একটা কথা বোঝাতে পারিনে, তোমরা রাত্রিদিন চাষীদের দুঃখ কষ্টের বর্ণনায় শতমুখ। তাদের দুঃখটা দেখতে পাও, আর পাওনা আমাদের দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অসীম দুঃখ, যার আদিও নেই অন্তও নেই। এর আরম্ভ হ'লো তখন থেকে যখন মা ঝি ছাড়িয়ে দিলেন, সংসারে দুধের এবং মাছের বরাদ্দ কমিয়ে ফেললেন, ছেলেটির ইস্কুল আর কলেজের মাইনে যোগাতে। তারপরে গায়ে থেকে গয়না খুলে দিলেন, কলেজের পরীক্ষার ফি জোগাতে। সংসারকে সর্ব্বদিক থেকে শোষণ করে চলল ছেলেটির এডুকেশনের পালা। তোমরা সত্যভাষায় যাকে ব'লো উচ্চতম শিক্ষা তাই তাকে দেওয়া হ'লো। মা আশা করে আছেন তাঁর ব্রত উদ্‌যাপনের দিন আসন্ন হয়ে' এলো। এতদিন যত দুঃখ সয়েছেন এইবারে সুদে আসলে তার শোধ হ'বে। বাবা আশা করে আছেন, আর ভাবনা কি, উপযুক্ত ছেলে হ'লো, এবার তারই উপার্জ্জনে সংসার চলবে শোধ হ'বে ঋণ, বিবাহযোগ্যা মেয়েটির বিবাহের সংস্থান হ'বে। তারপরে এই কলেজের তকমা আঁটা, উচ্চতম শিক্ষা পাওয়া ছেলেটির অদৃষ্টলিপি যে কী দাঁড়াবে, আর সংসারের বড় রাস্তাটার উপর তার য়ুনিভার্সিটির উপাধি এবং তক্‌মার বোঝা সমেত কেমন করে হোঁচট খেয়ে পড়বে

অসহায়ের মত সেটা তুমি কল্পনা করে না'ও। কল্পনাই বা করতে হ'বে কেন' চোখের সুমুখে নিতাই যে দেখতে পাচ্ছ।"

শান্তা দুধের বাটি হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার প্রদীপ্ত মুখের 'পরে প্রদীপের আলো আসিয়া পড়িয়াছিল, সে বাটীটা নামাইয়া রাখিয়া সেইখানে বসিল। প্রশান্তর দিকে চাহিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল, "তোমরা যে এত দেশের কাজ দেশের কাজ কর ভাই, কিন্তু আমার কাছে ওর কোন অর্থই নেই। আমি কিসের জন্য ভাবতে যাব দেশের ধন কি পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হ'লো, দেশের অন্ন সমস্যা বস্ত্র সমস্যা মিটল কিনা। আমার নিজের জীবনের সমস্যা কি কম। আমার বিয়ে হ'য়েছিল শিক্ষিত, উদ্যমশীল চরিত্রবান লোকের সঙ্গে। যে দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এমন সব যুবকদের'ও সারা জীবনটা নষ্ট হয়ে যায় ভাগ্যের বন্ধ দরজায় মাথা ঠু'কে। কোথাও কোন পথ নেই, কোন উপায় নেই এই জীবিকা সমস্যার। সেখানে এর চেয়ে'ও আর কি গভীর কথা এর চেয়ে'ও আরও কি মর্ম্মান্তিক কথা ভাবতে পারব!"

প্রশান্ত ধীর স্বরে বলিল, "বৌদি', আপনার একটা কথাও মিথ্যে নয়। কিন্তু এই জন্যেই তো দেশের কথা বেশি করে ভাববেন। আপনার স্বামীর মত দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ যুবক বুকভরা আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জীবন আরম্ভ করেও কোথাও কোন থই পাচ্ছেনা। যে সমাজ ব্যবস্থার ফলে আমাদের দেশের অধিকাংশ যুবকদের এমন

দশা, আপনি তার প্রতিকার চাইবেন না ? আপনি কেবল আপনার নিজের সংসারের কথাটাই ভাববেন ? এইটেকেই বাড়িয়ে নিয়ে দেশজোড়া করে দেখুননা, তখন দেখতে পাবেন, কত অবিচার কত অন্যায়। আর তখন এই যে মমতা এই যে আপ্রাণ চেষ্টা রয়েচে আপনার নিজের সংসারের প্রতি এইটেই বহু ব্যাপ্ত হয়ে পড়বে। তখন আর বিচার করবেননা কেবল ব্যথা পাবেন দেশজোড়া এই অনন্ত দুর্গতির দৃশ্যে। কেবল চেষ্টা করবেন তাই দূর করতে।"

প্রকাশের খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। সে ইহাদের উত্তেজিত কথোপকথন শুনিতেছিল। এখন ম্লান হাসিয়া বলিল, "বড় বড় কথা বলবার এবং তা নিয়ে ভাববার উৎসাহ এখন পর্য্যন্ত তোমাদের রয়েচে। আমায় তা'ও নেই। ভাবি, মিথ্যে কি হ'বে আমাদের মত লোকের ওসব অনন্ত আকাশের স্বপ্ন দেখে। তারচেয়ে সত্য বাবুর ছেলেটাকে কি করে ম্যাট্রিকুলেশনের ভবসাগর পার করিয়ে দিই তাই ভাবি, মুদির দোকানে আর গয়লার কাছে কত দেনা হয়েছে কি উপায়ে সেটা মেটান যায় তার একটা উপায় উদ্ভাবন করি।"

(৯)

প্রশান্ত আজ দশটার ট্রেণে কলিকাতায় ফিরিবে বলিয়া সকাল সকাল স্নান আহার সারিয়া প্রস্তুত হইতেছিল। তাহার খাওয়ার

সম্মুখে একটা হাত পাখা লইয়া বসিয়া শান্তা বলিল, "তুমি ভুলে যেওনা ঠাকুরপো, কলকাতা যেয়েই আমাকে সেলাই করবার উপযোগী কিছু কিছু কাপড় আর এম্‌ব্রয়েডারি করবার কলটা পাঠিয়ে দিও।"

"একি ভুলবার কথা যে বৌদি' ভুলে যাব। কিন্তু বড় ব্যথার সঙ্গেই আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চললাম। এইতো মোটে দিন কুড়ি বাইশ হ'লো এসেছিলাম কিন্তু এরই মধ্যে কত পরিবর্ত্তন দেখলাম। আপনি কি কিছু বুঝতে পারেন না বৌদি' ?"

প্রশ্নটা এড়াইয়া গিয়া শান্তা বলিল, "কি পরিবর্ত্তন দেখলে ?"

"আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন আপনার সংসারে কোথাও কোন বদল হয়েছে কি না। প্রথমদিন এসে আপনাদের পরিবারে যে নিভৃত শান্তি যে মনের আনন্দ দেখেছিলাম এখন তার বারো আনাই যেন নষ্ট হয়ে গেছে। প্রকাশদা' নিজের বাড়ীর মধ্যে সসঙ্কোচে অত্যন্ত অপ্রস্তুতের মত ঘুরে বেড়ান। কারো মনেই যেন আর সুখ নেই। দেখুন একটা কথা কিন্তু এইবারে আমি বুঝতে পারার কিনারায় এসেচি। এতকাল মাসিক পত্রে তুমুল যুক্তিতর্ক সমেত কত প্রবন্ধ পড়েচি, মেয়ে আর পুরুষে প্রয়োজনের তাগিদে একই সঙ্গে উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে নামলে তাতে ভাল ফল হয় কি না। তখন ভাবতুম, হয়ত লোকে যতটা বাড়িয়ে বলে ততটা নয়। হয়তো স্বামী স্ত্রী একই সঙ্গে উপার্জ্জন ক্ষেত্রে নামলে ফল ভালোই হয়। এই যেমন য়ুরোপে স্বামী হয়তো ডাক্তার স্ত্রী য়ুনি-

ভার্সিটির প্রফেসর কিংবা ষ্টেজের এ্যাকট্রেস স্বামীও নিজের জীবিকার প্রয়োজনে কাজ করচে। বাড়ী বলে তেমন একটা জিনিষ নেই। হয়তো বা ফিরে এসে একটা হোটেলে দু'জনে ডিনার খেয়ে একজন ক্লাব গেলেন একজন সিনেমা গেলেন। রাত্রিতে আপন সুবিধা মত সঙ্গের ল্যাচ্ কি দিয়ে দোর খুলে শয়ন করলেন। মনে হ'তো এ জীবন মন্দই বা কি। কিন্তু আপনার সংসারে দু'দিন এসে আমার ভুল ভেঙ্গে গেল। এখন খুব স্পষ্ট করেই বুঝেছি, যতই প্রয়োজন হো'ক মেয়ে পুরুষ দু'জনেই যদি জীবনের সংগ্রাম ক্ষেত্রে নেমে আসে তাতে ভালো কিছুই হয় না। জীবনের মাধুর্য্য, শান্তি, প্রভৃতি সমস্তই ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে।"

শান্তা মৃদু হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি যা ভয় করচ, অত ভয় করবার কিছুই নেই ঠাকুরপো। আমরা ইউরোপের সমাজে মানুষও হইনি আর তাদের মত বাইরের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যটাকেই জীবনের যথা সর্ব্বস্ব বলে আঁকড়ে ধরতে শিখি নাই। আমাকে এখন বিশেষ দরকারে পড়েই কিছু টাকা উপার্জ্জনের ভার নিতে হয়েচে। সময় হ'লেই ছেড়ে দেব। এ তো আমাদের সখ নয়, এ প্রয়োজন।"

সারাদিন সময় হয়না আদৌ। সকালের দিকটা রাঁধিতে হয়, ঘর দুয়ার গোছান পরিষ্কার করা, ঝাড়া মোছা এ সবই আছে। দুপুরে স্বামী কোর্টে বাহির হইয়া যাইবামাত্র শান্তা ছোটে ললিত

বাবুর বাড়ীতে অশোকাকে পড়াইবার জন্য। তিনটার সময় ফিরিয়া আসিয়া আবার রাত্রির খাওয়া দাওয়ার আয়োজন, চা জলখাবার তৈরী করা। মাস শেষ হইয়া গেলে ললিত বাবুর স্ত্রী চারখানা দশ টাকার নোট শান্তার হাতে গুঁজিয়া দিয়াছিলেন। প্রথমটায় শান্তার মুখ লাল হইয়া উঠিল, কষ্টে অন্যদিকে চাহিয়া সে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইল। তারপরে সেটুকু মনোবিকার আবার সুসহ হইয়া আসিল। এ চল্লিশ টাকা ছাড়া প্রকাশ নিজে দশ বারো টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে সারা মাসে। তথাপি মাসের শেষে টানাটানি হইল, অনেক খরচ অসঙ্কুলান হইল। সহরে বাড়ী ভাড়া দিয়া, ধোবার খরচ এবং দুধ, চাল, তরিতরকারী ইত্যাদি কিনিয়া অন্ততঃ সত্তর আশী টাকার কমে সংসার চলেনা। শান্তা রাত্রি জাগিয়া অনেক হিসাব পত্রের খসড়া করিয়া অনেক খরচ ছাঁটিয়া সংসারের মাসিক খরচের একথা বাজেট্ প্রস্তুত করিল। তথাপি দেখা গেল সত্তর টাকার কমে এ সংসারের খরচ চলেনা।

বিভ্রান্ত মনে সে কত কি ভাবিতেছিল। কোথাও কোন কিনারা দেখিতে পাইতেছিলনা এমন সময়ে হঠাৎ স্যাকরা গাড়ীর মাথায় প্রকাণ্ড একটা সুটকেস চড়াইয়া প্রশান্ত আসিয়া হাজির হইল। সে যাইবার পরে প্রায় কুড়ি বাইশ দিন কাটিয়া গেছে, তাহাকে দেখিবা-মাত্র শান্তার মনটা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সংসারের দুর্ভর ভাবনা যেন অকস্মাৎ কোন্ মন্ত্রবলে লঘু হইয়া গেল হাসিয়া বলিল, "এই যে

ঠাকুরপো, গরীব বৌদি'র ভাই নিশ্চয় কোন আকর্ষণ রয়েচে। তাই ক'লকাতার মত জায়গাতে যেয়েও এই কুঁড়েঘর ভুলতে পারোনা। তোমার ঐ প্রকাণ্ড ব্যাগটিতে কি রয়েচে? সেলাইয়ের সরঞ্জাম এনেচ বুঝি?

প্রশান্ত বসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ও সপ্তাহে আপনি যে ফুলকাটা টেবিলক্লথ আর ব্লাউজে নক্সা সেলাই করে পাঠিয়েছিলেন সেগুলি কলকাতায় খুব চড়াদামে বিক্রী হয়েছে। আপনার হাতের সেলাই খুব চমৎকার আর পরিষ্কার। একসঙ্গে মিশিয়ে রাখলে সাহেবি দোকানের কিংবা হোয়াইটওয়ে লেড্‌লার দোকানের জামা কাপড় থেকে তাদের চেনা যায় না। সমস্ত জিনিষ কয়েকটা পঁচিশ টাকা ন' আনায় বিক্রী হয়েছে। ওর থেকে সাড়ে পাঁচ টাকা কাপড় আর স্তোর দাম বাদ দিয়ে আপনার এই কুড়ি টাকা লাভ হয়েচে নিন। এমব্রয়েডারি করবার কল তখন কিনে পাঠাতে পারি নেই এই আজ নিয়ে এসেচি। এই যন্ত্রটির সাহায্যে আপনার কাজ আরও তাড়াতাড়ি এবং আরও ভালো হ'বে সন্দেহ নাই! আপনার সেলাইয়ের যেমন হাত দেখলাম আপনি তো অনায়াসে এর থেকে মাসে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকা উপার্জ্জন করতে পারেন। এবং ঘরে ব'সে পারেন। তবে খাটুনিটার দিকে লক্ষ্য রাখবেন।"

শান্তা অনেকদিন পরে আজ অতিমাত্রায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রশান্ত চলিয়া যাইবার পরের সময়টা তাহার নিরাশার

অন্ধকারে কাটিয়াছে, প্রাণপণে খাটিয়াও কোথাও কোন কূল দেখিতে পায় নাই। কাল গয়লা আসিয়া জানাইয়া গিয়াছে, তাহার দুধের দাম এত বাকী পড়িয়া গিয়াছে যে অন্ততঃ কিছুও না পাইলে সে আর দুধ দিতে পারিবে না। কেমন করিয়া কি করিবে, সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। প্রশান্তর টাকাটা পাইয়া অনেক দিন পরে মনে একটা শান্তি আসিল। বলিল, "আমি যথাসাধ্য তোমাকে সেলাই করে পাঠাব ভাই। সেলাই করতে আর এমন কি পরিশ্রম। তুমি আমাকে কাট ছাঁট শিখবার জন্যে যে বইটা দিয়েছিলে তার থেকে অনেক সাহায্য হয়। শোভা কোথা গেলি, ঐ দেখ তোর কাকাবাবু এসেচেন, চা তৈরী কর।"

"আমি এখনই উঠব, নইলে ট্রেণ ফেল হয়ে যাবে বৌদি', ষ্টেশন থেকে এইমাত্র চা খেয়ে আসচি।·········আপনি শুনবেন না, আচ্ছা তাহ'লে দিন। প্রকাশদা' কোথায়? বেরিয়ে গেছেন। ওঁকে আজকাল বাড়ীতে পাওয়াই ভার।—এই যে শোভা কেমন আছিস? বেশতো ফিতে দিয়ে বেণী ঝুলিয়েছিস। তোর জন্যে মৌচাক আর সন্দেশ দু'টো কাগজ পাঠাতে বলে এসেচি, প্রতিমাসের পয়লা তোর কাছে এসে হাজির হবে।"

শোভা প্রশান্তকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহার মধ্যেই একটা ভাড়াটে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল এবং প্রশান্ত চলিয়া গেল।

শোভা ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, কাকাবাবু চলে গেলেন কেন?"

"উনি আমাকে গোটাকতক জিনিষ দিতে এসেছিলেন মা, দিয়ে চলে গেলেন। ওঁর কত কাজ, কত গরীব দুঃখী লোক ওঁর পথ চেয়ে বসে থাকে, উনি কি কোন এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে পারেন।"

কাকাবাবু সম্বন্ধে শোভার বরাবরই অত্যন্ত একটা উচ্চ ধারণা ছিল। এখন সে বিস্ফারিত নেত্রে ভাবিতে লাগিল, তাঁহার কাজের ঘটাটাই বা কেমন, আর কত অজানা দূর দেশের কত গরীব দুঃখীই না জানি তাঁর পথ পানে চাহিয়া দিন কাটাইতেছে।

(১০)

শান্তা নিজের মনকে প্রস্তুত করিয়া লইল। যেমন করিয়া হো'ক সংসারের সমস্ত খরচ তাহাকে চালাইতেই হইবে। রাত্রি আটটার পরে রান্নাঘরের কাজ মিটাইয়া স্বামীর আহার্য্য চাপা দিয়া রাখিয়া বাতির আলোটা উস্কাইয়া দিয়া সে সেলাইয়ের কলটা লইয়া বসিয়াছিল। বাইরে জুতার শব্দ হইল, পরক্ষণে প্রকাশ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "আজ আর কিছু খাব না, এক গ্লাস জল দাও শুধু।"

বলিয়াই সে বাহিরে চলিয়া আসিল। সেলাইয়ের সমস্ত সরঞ্জাম গুছাইয়া রাখিয়া জলের গ্লাস হাতে বাইরে আসিয়া দেখিল, অন্ধকারের মধ্যে প্রকাশ একটা চেয়ারে বসিয়া আছে। কাছে যাইয়া সে স্নিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্ধকারে একা বসে রয়েচ কেন! আর রাত্রিতে শুধু শুধু খাবেই বা না কেন? শরীর খারাপ না কি?"

প্রকাশ নিস্পৃহকণ্ঠে উত্তর করিল, "না, শরীর তেমন খারাপ নয়। এমনই খাবনা। কেমন যেন প্রবৃত্তি হচ্ছে না।"

স্বামীর কণ্ঠস্বরে যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ছিল তাহা বুঝিতে পারিয়া শান্তার মন মুহূর্ত্তের মধ্যে কঠিন হইয়া উঠিল। একেই তো সারাদিন অবিশ্রান্ত খাটুনীর ফলে তাহার শরীর এবং মন শ্রান্তির চরম সীমানায় পৌঁছিয়াছিল, সে কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন প্রবৃত্তিই বা হবেনা কেন? স্ত্রীর উপার্জ্জনের অন্ন বলে নাকি?—কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সে চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ একি কথা সে বলিয়া ফেলিল! অন্ধকারের মধ্যে প্রকাশের দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে ধীরে বলিল, '"অনেকটা তাই। কিন্তু আর কি তোমার কিছু ব'লবার আছে? যদি আর কিছু না থাকে, তবে নিজের কাজে যাও। আমার একটু বিশ্রাম করবার খুবই দরকার।"

সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া শান্তা উদ্বেলিত চিত্তে মনে মনে

কত ক্ষমার প্রার্থনা কত আকুল মিনতি আবৃত্তি করিতেছিল কিন্তু প্রকাশের শান্ত পরুষ বাক্যের পরে তাহার মুখ হইতে বাহির হইল, "বিশ্রামের দরকার কি একা তোমারই আছে মনে কর? তোমার চেয়ে ঢের বেশি খাটুনি যাদের খাটতে হয় তারাই জানে সমস্ত দিন প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তি আর সূক্ষ্ম চুল চেরা বিচার করলেই কেবল দিন কাটে না।"

প্রকাশ কোন উত্তর করিল না। নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। শান্তা অপমানিত ভাবে সেই অন্ধকর নিষ্ঠুর নৈঃশব্দের কাছে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া আসিল।

বাহিরে মৃদু মৃদু হাওয়া দিতেছিল। সেইখানে বসিয়া প্রকাশের মনে হইতেছিল জীবন সংগ্রামের সমস্ত শ্রান্তি যে নিঃশেষে হরণ করিয়া লইতে পারে সেই শান্তিরূপিনী স্ত্রী একদিন তো তাহারও ছিল। সে হঠাৎ এমন হইয়া গেল কেন? মনে পড়ে মুঙ্গেরের সেই বড় মোকর্দ্দমাটায় যখন কিছুদিন কাজ করিয়াছিল, কোন কোন দিন সিনিয়র উকীলের বাড়ী হইতে ফিরিতে তার রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত বাজিয়া যাইত। শান্তা হেঁসেল আগলাইয়া কী উদ্বেগ এবং কতখানি ব্যাকুলতার সহিত তার আসিবার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিত। তাহার এই আচরণের জন্য কতবার প্রকাশ মৃদু সস্নেহ অনুযোগ করিয়াছে, "কেনই বা এত রাত অবধি বসে থাক শানু? আমার খাবারটা ঢাকা দিয়ে রেখে দেবার ব্যবস্থা করা যায় না কি?

এ কথার উত্তর শান্তা কথা বলিয়া দিত না, কিন্তু তাহার মুখে যে অবিশ্বাস্য মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিত তাহাতেই অনেক কথা বিলীন হইয়া থাকিত।

তখনও তো জীবন সংগ্রামের বোঝা এতটুকু কম ভারি ছিল না কিন্তু সে সংগ্রামের সমস্ত রুক্ষতা এবং তিক্ততা হরণ করিয়া লইয়াছিল যে, সে আজ কোন ছলে অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। প্রকাশ নিজের মনকে অনেক প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিল, মনে মনে ভাবিতে চেষ্টা করিল, শান্তা সংসারের অনেক গুরুতর ভার নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়াছে, তাহা না হইলে আজ হয়তো দুর্দ্দশার অন্ত থাকিতনা।

তাহাকে অন্ন অর্থ উপার্জ্জনের জন্য অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয়, হয়তো সেই জন্যই প্রকৃতির কোমলতা তাহার কমিয়া যাইতেছে। এজন্য অভিযোগ করিবার তাহার কিইবা থাকিতে পারে। কিন্তু যুক্তি দিয়া মনকে বোঝান গেলেও হৃদয় প্রবোধ মানেনা। যাহা চলিয়া গেছে তাহারই পিছনে ঘুরিয়া মরে।

সেই সীমাহীন অন্ধকারে দুই চোখ মেলিয়া প্রকাশ এই সত্যই সমস্ত মনে প্রাণে অনুভব করিতে লাগিল। পাশের ঘরে সেলাইয়ের ঘর্ঘর শব্দ একটানা অবিচ্ছিন্ন গতিতে শোনা যাইতে লাগিল। শান্তার অভিমান করিবার অবসর নাই, অতীতের স্মৃতি যে ম্লান করুণতায় তাহার হৃদয় প্রান্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে সেটুকু বিরাম-অবসর সে কোথা হইতে পাইবে? এই রাত্রির অবসরটুকুর মধ্যেই তাহাকে

অন্ততঃ খান তিনি চারেক জামা সেলাই করিয়া রাখিতে হইবে। টাকা তাহার চাই। যেমন করিয়া হো'ক এই টাকা তাহাকে জোগাড় করিতে হইবে। না হইলে সংসারের চাকা অচল হইয়া যাইবে। রাত্রির অন্ধকারে কেরোসিনের বাতির ক্ষীণ আলোকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে অবিশ্রান্ত কল চালাইয়া যাইতে লাগিল। সেলাই করিতে করিতে তাহার শ্রান্ত অবসন্ন শরীর একটুখানি ঘুমাইতে পাইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল চোখ দু'টা জ্বালা করিতে লাগিল। তথাপি চাকা ঘুরিতেছে। একটা ফ্রিল বসাইতে গিয়া ভুল হইয়া গেল, বিরক্তচিত্তে সেটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, বাতির আলোটা উস্কাইয়া সে আবার নতুন করিয়া ফ্রিল দিতে বসিল। উত্যক্ত চিত্তের উপর অভিমান তাহার স্নিগ্ধ করুণতা লইয়া দেখা দিতে পারিল না, কেবল রাখিয়া গেল অত্যন্ত একটা জ্বালা। মনে হইতে লাগিল, শরীরপাত করিয়া সংসার চালাইতেছি। তবু কাহারও এতটুকু সহানুভূতি নাই স্নেহ নাই। এমন হইলে মানুষে বাঁচে কেমন করিয়া।

কতক্ষণ পরে ঘুমে অচেতন হইয়া সেলাইয়ের কলের পাশে ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সেলাইয়ের মাঝখানে মাদুরের উপর সে ঘুমাইয়া পড়িল।

(১১)

গভীর রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সদ্যনিদ্রোত্থিত চোখ মেলিয়া শান্তার কেমন অদ্ভুত লাগিল। আকাশের পূর্ব্বকোণে মেঘ

জমিয়া কখন ঠাণ্ডা এলোমেলো বাতাস দিতে সুরু হইয়াছে। শীত শীত করিতেছে। চোখ চাহিয়া বুঝিতে পারিল নিদ্রিত স্বামী এবং কন্যার পাশে উষ্ণ স্নেহ কোমল শয্যায় সেতো শুইয়া নাই। মাটিতে একা মাতুরের উপর কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। চারিদিকে অসম্পূর্ণ জামার কাটা টুকরাগুলা বাতাসে উড়িতেছে। খোলা জানালাটা দিয়া বৃষ্টির ছাঁট আসিতেছে। এত শীত করিতেছিল, উঠিয়া জানালাটা বন্ধ করিতে যাইয়া জানালার গরাদে ধরিয়া অন্ধকার বৃষ্টি-পাতের দিকে সে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। জীবনটা কেমন যেন অসাড়ের মত হইয়া গিয়াছে। মনের তারে কিছুই ধ্বনিত হইয়া ওঠেনা। জীবনের কোমলতম সূক্ষ্মতম দিকগুলা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে অন্ধকারের নীরবতার মধ্যে বৃষ্টি পড়িতেছে, এ দৃশ্যের মাঝে শান্তা আগে কত রস পাইয়াছে, কত রাত্রিতে স্বামীকে উঠাইয়া তাঁহার সঙ্গে এ বস্তু উপভোগ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতা কত আপনমনে আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছে। আজ মনে হয় অল্পদিন মাত্র আগের সে সব স্মৃতি যেন কত যুগান্ত আগেকার, এ জীবনে নয়, সে যেন পূর্ব্ব জন্মের। এখন দিনের আরম্ভ হয় অবসাদে ক্লান্তিতে, অর্থের দুশ্চিন্তায়। শেষ হয় একটানা শ্রান্ত গতিতে। জানালাটা বন্ধ করিয়া আসিয়া সে সেলাইয়ের টুকরাগুলা গুছাইয়া রাখিল। আলো কমাইয়া মশারি তুলিয়া সুপ্ত মেয়ের পাশে চুপ করিয়া আসিয়া শুইল। চাহিয়া দেখিল পাশের শয্যা শূন্য। স্বামী তখনও আসেন

নাই। প্রকাশ পাশের ঘরে আলো জ্বালিয়া তখনও কি লিখিতেছিল। কলমের খস খস শব্দ, চুরুটের ধোঁয়া, তাহার কাশির আওয়াজে শান্তা বুঝিতে পারিল সে তখনও ঘুমায় নাই, জাগিয়া লিখিতেছে। মিনিট পনের পরে প্রকাশ আসিয়া মশারি তুলিয়া ঝুপ করিয়া শুইয়া পড়িল। শান্তা বুঝিতে পারিল শুইয়া পড়িলেও সে ঘুমাইতে পারে নাই, তাহার স্বামীও বুঝিল শান্তা এখনও জাগিয়া আছে। কিন্তু দু'জনের মধ্যে একটাও কথা হইলনা। বাহিরে অন্ধকার রাত্রি উত্তরোত্তর উত্তাল হইয়া উঠিতে লাগিল। জোরে জোরে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ঝড়ের হাওয়া বন্ধ দুয়ারে প্রতিহত হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল।

পরদিন সকালে অনেক বেলাতে ঘুম ভাঙ্গিল শান্তার। জানালা বন্ধ, বাহিরে বেলা হইয়াছে বুঝিতে পারে নাই। গতরাত্রির অনিদ্রায় শরীর ক্লান্ত ছিল। উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, সমস্ত কাজ পড়িয়া আছে। রান্নাঘরের এঁটো বাসনগুলা অবধি এখনও মুক্ত করা হয় নাই। নীচে নামিয়া আসিতেই শোভা উৎফুল্ল মুখে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, "মা আমি চা খেলাম, বিস্কুট খেলাম, ছোট একরকমের কেক খেলাম। বাবা এখনই গলির মোড়ের দোকান থেকে কিনে আনলেন। ভারী মজা। তুমি রোজ দেরী করে উঠো মা। তাহ'লেই বাবা সকালে উঠে চা পাবেনা। আর দোকান থেকে আনবে।"

শান্তা ঠাস্ করিয়া মেয়ের গালে এক চড় মারিল।

"যা যা, আমাকে বিরক্ত করিসনে। বেশ করেচি আমি বেলায় উঠেচি। তোমাদের আর কি ব'লো, দিব্যি পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে আছ, আর খাচ্ছ। যাকে চালাতে হয় সেই জানে।"—কথাটা অবশ্যই একরত্তি মেয়ে শোভাকেই লক্ষ্য করিয়া বলে নাই। এক-তালার বাইরের দিককার ঘরখানায় বসিয়া প্রকাশ একমনে মোটা মোটা কতকগুলা আইনের বই পড়িতেছিল, তাহারই উদ্দেশে বর্ষিত হইল। শোভা কথার জন্য না হউক চড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিল। শান্তা তাহার প্রাত্যহিক কাজের মধ্যে মগ্ন হইয়া গেল। এমন অবসর হইলনা যে মেয়েটাকে দু'দণ্ড আদর করিয়া ভোলায়। উনুনে আঁচ আসিলে আর একবার জল গরম করিয়া চা তৈরী শেষ হইলে এক পেয়ালা চা হাতে করিয়া সে প্রকাশের সুমুখে ধরিয়া দিতে আসিয়া দেখিল, বারান্দার এক কোণে মুখ গুঁজিয়া শোভা তখনও ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। দেখিয়া তাহার মনটা কেমন করিয়া উঠিল। কোন দোষ করে নাই, বেচারা ছোট মেয়ে আনন্দ করিয়া সকাল বেলায় একটা কথা বলিতে আসিয়া মায়ের কাছে অমন করিয়া মার খাইল। মনে করিল চা দিয়া আসিয়া এখনই তাহাকে ভুলাইয়া আনিবে। কিন্তু উল্টো ফল হইল।

প্রকাশের কাছে চায়ের পেয়ালাটা নামাইবামাত্র সে বলিল, "আমার একটি অনুরোধ রাখবে শান্তা ?"

"বলো"—কঠিন সুরে জবাব আসিল

"তোমার আমার মধ্যে জীবনের যে অপ্রতিবিধেয় জটিলতা বা অশান্তি এসেচে, যার জন্যে তোমার অক্ষম দরিদ্র অযোগ্য স্বামী দায়ী, তার শাস্তি যা দিতে হয় আমাকেই দাও। কিন্তু শোভা আমার বড় আদরের, বিনা দোষে তার উপর মারধর করোনা।"

শান্তার যেটুকু ধৈর্য্য অবশিষ্ট ছিল তাহাও উড়িয়া গেল, কি একটা শক্ত কথা বলিতে গিয়া আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া বলিল, "আমি যে অহরহঃ কাউকে শাস্তি দিচ্ছি তা আমার মনে হয় না। আর শোভার বিষয়ে যদি কিছু ব'লো তবে এইটুকু মনে করে রেখো, ও যেমন তোমার মেয়ে তেমনি আমারও। তোমার একারই যে কেবল আদরের তা নয়।"

আর কোন কথা বা কোন উত্তরের অপেক্ষামাত্র না রাখিয়াই সে সশব্দ দ্রুত পদে সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

কাজ কর্ম্ম সমস্ত সারা হইয়া গেলে সে যখন ললিতবাবুদের বাড়ীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, শোভা বলিল, "মা আমাকে নিয়ে যেওনা।"

"কেন একলা থাকবি কার কাছে?"

"না আমি যাবনা। কাল আমাকে ওদের বাড়ীর মেজগিন্নী ব'লেছিলেন, তোর মা এখানে কাজ করতে আসে, তুই কিসের জন্যে এখানে গোলমাল করতে আসিস? না মা, আমার ভারী লজ্জা করে।"

খোকা।

শান্তার দুই চোখে আগুন জ্বলিতে লাগিল। এই তো তার একটিমাত্র মেয়ে, সকাল বেলায় একটা কথা আনন্দ করিতে করিতে বলিতে আসিয়া বিনা দোষে মায়ের কাছে মার খাইল। পরের বাড়ীতে সারাটা দুপুর চোরের মত কাটায়। ললিতবাবুর নাত্‌নীকে যে ঘরে গান, এস্রাজ সেলাই শেখায় সে ঘরে তাহার প্রবেশাধিকার নাই। একদিন এস্রাজের তার ছিঁড়িয়াছিল বলিয়া অশোকার মা তাহাকে বকিয়াছিলেন, সে ঘরে ঢুকিতে বারণ করিয়াছিলেন।

শান্তা মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা তুই যাসনে। পথে যেতে মিলনের বাড়ীতে তোকে রেখে যাব। সেখানে খানিকক্ষণ তার সঙ্গে খেলা করবি, গল্পের বই পড়বি। মিলন তোর বন্ধু। তোর বাঁধানো সন্দেশটা সঙ্গে নে, সেখানে দু'জনে মিলে পড়বি। এখানে একা কোথায় থাকবি ? তোর বাবা কোর্টে বেরিয়ে গেছেন। দোরে চাবি দিয়ে যাব।"

শোভা অতিমাত্রায় উৎসাহিত হইয়া বলিল, "সেই ভালো মা। মিলনদের বাড়ীতে আমাকে রেখে যাও মা, আসবার সময় কিন্তু মনে করে নিয়ে এস। ভুলোনা।"

মেয়ের কথা শুনিয়া মা হাসিয়া ফেলিল।

"নারে, নিশ্চয় ভুলে যাবনা। এই আঁচলে গিঁট বাঁধলুম, আর ভুলছিনে"

দু'জনে মিলিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দুয়ারে তালা লাগাইয়া

সহরের মোহ

অশোকার ঘরের সামনে পৌঁছিয়া দেখিল দ্বার অর্গলবদ্ধ। আজ সকাল হইতেই নানারকম ভাবে ব্যথা পাইয়া শান্তার মন ভালো ছিলনা, সে তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া বাড়ী যাইতে পারিলে বাঁচিয়া যায়। রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করাতে অশোকা লজ্জানত মুখে ত্রস্ত ভাবে বাহির হইয়া আসিল। অন্য সময় হইলে হয়তো তাহার মুখের ভাব মাত্র দেখিয়া শান্তা অনেক কথা আন্দাজ করিয়া লইতে পারিত। কিন্তু কোন কথা ভাবিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিলনা। একটুখানি অনুযোগের সুরে কহিল, "তুমি জানতেনা অশোকা রোজ এসময়ে আমি আসি। অথচ দিব্যি দোর বন্ধ করে রয়েছ। আমার সময়ের কি একটা দাম নেই মনে কর?"

অশোকা অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, "আজ উনি এসেচেন বেলা এগারো-টার ট্রেণে। আজ একটু অবসর করে অন্য কোন সময়ে আসতে পারেননা মাসীমা?"

নিমেষের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা উপলব্ধি করিয়া শান্তার লজ্জার অবধি রহিলনা। এই কিশোরীটি প্রিয় সমাগমের আনন্দে পরিপূর্ণ বসন্তব্রততীর মত ছল ছল করিতেছে। আর সে কোথায় ছন্নছাড়া শ্রীহীন এক গৃহের গৃহিণী, সকাল বেলায় স্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া মেয়েকে বিনা দোষে মারিয়া ধরিয়া তাহাকে পরের বাড়ীর একজনের কাছে জিম্মায় রাখিয়া নিজের চাকরির হাজিরা দিতে আসিয়াছে। একটুখানি হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা আজ তাহ'লে আসি অশোকা।

আজ আর বোধ হয় আসবার অবসর হ'বেনা। তোমার সময় হ'লে খবর দিও।"

অশোকা লজ্জা পাইয়াই বোধকরি মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শান্তা চলিয়া আসিতেছে এমন সময় পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের অতিশয় সুশ্রী একটি যুবক ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া শান্তার নিকট দাঁড়াইল। নমস্কার করিয়া বলিল, "আমিই অশোকার স্বামী। আপনি একটু বসুননা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলে যাচ্ছেন। অশোকাকে এত যত্ন করে শেখালেন সেজন্যে আমার যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা আর অসংখ্য ধন্যবাদ জানবেন। অশোকাও মৃদুস্বরে শান্তাকে আর একটু বসিবার জন্য অনুরোধ জানাইল। তেমন ইচ্ছা না থাকিলেও শান্তাকে ঘরের ভিতরে আসিয়া বসিতে হইল। অশোকার স্বামী রমেন্দ্রনাথই প্রথমে কথা বলিল।

আর এক দফা ধন্যবাদ নিবেদন করিয়া বলিল, "বোধহয় আরও কিছুদিন অশোকা আপনার কাছে শিখতে পারলে ভালো হো'ত নয়?"

শান্তা মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, "হাঁ তাই বটে। এইতো সবে-মাত্র শিখতে সুরু করেছিল। কেন ও কি আর শিখবেনা?"

একটু ইতঃস্তত: করিয়া রমেন্দ্র বলিল, "অনেকটা হয়ে দাঁড়াল তাই। যদিও আমার বিশেষ ইচ্ছা আরও কিছুদিন শিখুক। এই মাসে আমায় হুগলীতে বদলী করেচে, নতুন বাসার নতুন ঠাকুর আর

চাকরটা হয়েচে যেমন বোকা তেমনই বজ্জাত। খাওয়া দাওয়ার ভারি অসুবিধে হচ্ছে। আর সমস্তই বিশৃঙ্খল এলোমেলো। তাই জন্যে মনে করেচি, ওকে নিয়ে যাই। না নিয়ে গেলে আর চলছেনা।”

শাস্তার মনে হইতে লাগিল, ইহারা কত সুখী। মনের মিলের সঙ্গে ভগবান প্রচুর অর্থ দিয়াছেন। স্বামীর খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হইলে স্ত্রীকে লেখাপড়া গানবাজনা শিখিবার জন্য কি করিতে অন্য জায়গায় ফেলিয়া রাখিবে। দরকার কি ওসবে, সামান্য সখ বই তো নয়।

অশোকাও এতক্ষণে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, “জানেন মাসীমা, হুগলীর চাকরকে চা তৈরী করতে বল্লেই সে দুধ চিনি চা সমস্ত এক সঙ্গে দিয়ে সেদ্ধ করে কি একটা অপূর্ব্ব জিনিষ তৈরী করে দেয়।”

রমেন্দ্র বলিল, “আর আমার বাসার ঠাকুরকে একদিন বলেছিলুম, নিমঝোল আর সুক্তো রাঁধ। সে এমন করে—অবাক হ’য়ে আমার মুখের দিকে চাইলে যেন অদ্ভুত কি একটা কথা বলেচি!”

অশোকা বলিল, “মা গো, তাই নাকি? তাহ’লে বল রান্নার কিছু সে জানেনা।”

“জানেনাইতো। শুধু ভোজের রান্না শিখেচে। পোলাউ কালিয়া চপ্ কাট্‌লেট্ রোজ রোজ মানুষে তাই খেতে পারে?”

“তা কেমন করে পারবে? আর রোজ ঐ সব খেলে অসুখে পড়ে যেতে কতক্ষণ।”

শান্তা হাসি চাপিয়া ইহাদের কথা এতক্ষণ শুনিতেছিল। এবারে ম্না বলিল, "যাই অশোকা এবারে, তুমি যাবার আগে একদিন আমাদের বাড়ীতে যেও। যা শিখেচ, তা'ও অনেক। মাঝে মাঝে চর্চ্চা রেখ। একেবারে ছেড়ে দিওনা।"

অশোকার ঘর পার হইয়া নীচে নামিয়া আসিতে আসিতে শান্তা অশোকার দিদিমার হাতে পড়িল। বৃদ্ধা গৃহিণীর মুখ হাসি হাসি, অত্যন্ত একটা সুখবর যেন এইমাত্র তিনি পাইয়াছেন। তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া টানিয়া নিজের ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "অশোকার সঙ্গে দেখা করে এলে? শুনেচ তো সব নাতজামাই এইবারে আর একা ফিরবেনা, জোড়ে যাবে। তোমার হাতের গুণ আছে মা তা অস্বীকার করবার যো কি!" জলখাবার আনাইয়া শান্তাকে জোর করিয়া খাওয়াইলেন, বলিলেন, "আজ মেয়েকে আনোনি? তাকে কোথায় রেখে এলে?"

শান্তা এতক্ষণ অনেকটা আনন্দে ছিল, শোভার প্রসঙ্গ ওঠ্বামাত্র তাহার মন কঠিন হইয়া গেল। এই বড়লোকের বাড়ীতে সে বেতন-ভোগী শিক্ষয়িত্রী মাত্র। প্রয়োজন নাই, কাল হইতে আর আসিবে না। আর কোন কথার উত্তর না দিয়া সংক্ষেপে বিদায় লইয়া সে নীচে নামিয়া আসিল।

মিলনের বাড়ীতে শোভাকে আনিতে যাইয়া দেখিল সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘুমভাঙ্গা চোখ মুছিয়া শোভা জিজ্ঞাসা করিল, "মা, এত শীগ্গীর এলে যে?"

"হ্যাঁ, আজ তোর জন্যে মন কেমন করছিল। তাই থাকলুমনা। মনে করচি, কাল থেকে আর যাবনা। রোজ রোজ তোকে ছেড়ে যেতে হ'বে, ভালো লাগেনা। শেভো অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিল, "সেই ভালো।"

(১২)

শান্তা ভাবিতেছিল, এরকম বড়লোকের বাড়ীতে আর চাকরী লইবেনা। ইহাদের কোন ঠিক ঠিকানা নাই। তখনই স্ত্রী গান বাজনা জানেনা বলিয়া নাকে কাঁদিতে ব'সে, আবার দু'দিন পরে হয়তো গান টানের ধারও ধারিবেনা। তখন তরকারীতে নূন কম এবং পানে চুণ বেশি হইলে রাগিয়া বকিয়া অনর্থ করিবে। অথচ কোন একটা উপায়ে সংসার চালাইবার মত টাকা কিছু উপার্জ্জন করিতে না পারিলে সংসারই বা চলে কেমন করিয়া। ললিতবাবুর গৃহিনী চল্লিশ টাকার চারখানা দশটাকার নোট আর কাগজে মোড়া একটি পুলিন্দা চাকরের হাতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। টাকা কয়েকটা বাক্সে তুলিয়া পুলিন্দাটা খুলিয়া সে দেখিল তাহার জন্য একজোড়া সৌখীন শাড়ি আর শোভার জন্য গোটা দুই ফ্রক রহিয়াছে। গৃহিনী একখানি পত্রে লেখা করাইয়াছেন, "মা, এগুলি তুমি ফেরত দিওনা। আমাদের দেশে মেয়ে বা বৌ বিদায় লইয়া শ্বশুরবাড়ী কিংবা বাপের

বাড়ী গেলে তাহাকে বিদায়ী কাপড় দিতে হয়। আমার ঘর হইতে তুমি বিদায় লইয়া গেলে তাই এগুলি পাঠাইলাম। কাল অশোকার বর এক প্রীতিভোজ দিবে, তোমার ও তোমার স্বামীর নিমন্ত্রণ থাকিল, নিশ্চয় আসিবে। যথাসময়ে ওরা ছাপানো কার্ড না কি তাই পাঠাইবে বলিয়াছে, আমি বলি অতয় কাজ কি, নিজের হাতে তুমি অশোকাকে শিখাইলে পড়াইলে, আজ তার স্বামীর বাড়ী চলিয়া যাওয়ার সময়ে আনন্দ করিতে কি একবার আসিবেনা ?"

শান্তা একটু হাসিয়া কাপড়ের পুলিন্দাটা তুলিয়া রাখিল। গিন্নী আর যাই হো'ক ঐ একবাড়ী লোকের মধ্যে ভালো লোক ছিলেন। মাথার উপর আসন্ন অর্থের চিন্তা সত্ত্বেও শান্তার আজকের দিনটা বিশেষ ভালো লাগিতেছিল। কোন কাজ নাই, এখনই তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সারিয়া কাজের ধাক্কায় ছুটিতে হইবে না; অনেক কোলাহল অনেক শ্রান্তি পার হইয়া আসিয়া উষ্ণ চির পরিচিত নীড়খানি পাখীর যেমন লাগে, আজ তাহার ঠিক তেমনই লাগিতেছিল। শোভাকে সঙ্গে লইয়া ঘরের আনাচ কানাচ সমস্ত সে পরিষ্কার করিল। এই সব ছোটখাট কাজে কত রস আছে, একথা কতদিন সে যেন ভুলিয়াছিল। স্বামীর ঘরে ঢুকিয়া পোষাকগুলি ঝাড়িয়া রাখিল, বইয়ের ধুলা মুছিল। ঘর দ্বার ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার তকতকে করিয়া রাখিল। পিওন আসিয়া ডাকাডাকি করিতেছিল, প্রশান্তর নিকট হইতে একটা মনিঅর্ডার আসিয়াছি, একুশ টাকা সাত আনা।

শান্তার প্রেরিত জামাগুলি বিক্রয় করিয়া যে টাকাটা লাভ হইয়াছে, পাঠাইয়া দিয়াছে। পুনশ্চ নিবেদনে, এই গ্রীষ্মের ছুটিতে একবার নিশ্চয় করিয়া কলিকাতা আসিতে লিখিয়াছে।

প্রকাশ বাড়ী ফিরিল সন্ধ্যা করিয়া। একটা রেকাবীতে গরম হালুয়া ও এক পেয়ালা ধূমোত্থিত চা শান্তা নিকটে আনিয়া রাখিল। শোভা ভিজা গামছা আনিয়া রাখিল, আলনা হইতে সদ্য-ধৌত ধুতি পাড়িয়া দিল। শান্ত জুতার ফিতা খুলিয়া দিয়া কাছারির পোষাক ছাড়াইয়া রাখিল। এই গৃহের গৃহস্বামীকে আজ মহাসমারোহে তাঁহার কেন্দ্র স্থানটিতে প্রতিষ্ঠা করা হইল। আজ যেন তিনি শ্রীহীন পসার শূন্য উকীল নহেন। এই গৃহের সমস্ত মনোযোগ এবং সমস্ত আলো একীভূত হইয়া তাঁহার মুখের উপর পড়িয়া তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিল।

প্রকাশ এই পরিবর্ত্তনের সুরটা স্পষ্ট করিয়া ধরিতে পারিল। নিজেও খানিকটা অনুতপ্ত হইল অযথা সামান্য কারণে স্ত্রীর উপর কঠিন ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া। আকাশে মেঘ ঘনাইয়া আসিতে-ছিল, একটু পরে কালবৈশাখীর ঝড় আরম্ভ হইল এবং খানিকক্ষণ পরে ঝড় থামিয়া গিয়া স্নিগ্ধ বারিপতনের শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল। বারান্দায় আজ শান্তা রান্না করিতেছিল তোলা উনুনে। আর সমস্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল মাংসটা চাপানো আছে। আজ ঘরে ঘরে আলো জ্বলিতেছে, ধূপ-ধুনার গন্ধ উঠিতেছে, শোভা হাসিমুখে

আলোর কাছে বসিয়া কি একটা গল্পের বই পড়িতেছে। এই শান্তি এই বিশ্বের আরাম আর তৃপ্তিমাখানো ঘরের ছোটখাট আনন্দ—শান্তা চোখ বুজিয়া একবার অনুভব করিল, ইহার কাছে আর সমস্ত আনন্দ ম্লান হইয়া যায়। বাইরের কার্য্যক্ষেত্রে খুব একটা নাম করিয়া হয়তো উত্তেজনা পাওয়া যায় নিজের শক্তির পরিচয়ে মনে গর্ব্ব আসে। কিন্তু এমন সর্ব্বাঙ্গীন তৃপ্তি আর মধুরতা তাহাতে নাই। একথাটা এমন করিয়া এ৯ই স্পষ্টরূপে আর কখনো তাহার চোখে ধরা পড়ে নাই। আজ যেন সেটা বড় বেশি করিয়া অনুভব করিতে পারিল।

(১৩)

অথচ এটুকু আনন্দও তাহার ভাগ্যে বেশিদিন টিঁকিল না। ললিত বাবুদের বাড়ীর কাজটা আর নাই। সংসারের কাজ করিয়া যতটা সময় পায় দিবারাত্রি সেলাইয়ের কল চালাইয়াও মাসে কুড়ি একুশটাকার বেশী লাভ হয় না। এতটাও হয়তো হইত না। কেবল প্রশান্তর ঐকান্তিক সহযোগিতায় হয়। প্রকাশ রোজ কোর্ট যায় আসে, রোজই আশায় আশায় থাকে, হয়তো বা একটা কিছু লাগিয়া যাইবে। ফিরিয়া আসে সন্ধ্যার দিকে হতাশমুখে। ফিরিয়া আসিয়া মুখ হাত ধুইয়া চা খাইয়া একটা টিউশনি করিতে যায়। গোটাপনের টাকা পায় তাহাতে।

সহরের মোহ

সকালবেলায় শান্তা রান্না করিতেছিল, প্রকাশ ম্লান হাসিয়া বলিল, "আমাদের মত দরিদ্রেরও আবার হৃদয়বৃত্তি বলে জিনিষ থাকে। তুমি উপার্জ্জন ক'রতে সেটাও সইতে পারতুম না। আবার না করলেও যে সংসার অচল হচ্ছে, এ কথাটাও কোন মতে অস্বীকার করবার যো নেই।"

শান্তা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি একটু ভুল বুঝেছিলে, যেখানে জীবনের ভোগবিলাসের মাপকাঠি এতবড় হয়ে গেছে যে সেইজন্যে অপরিমিত অর্থসংগ্রহের নেশায় স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই ঘরের আগাল ভেঙ্গে দিয়ে বাইরে চলে আসতে হয়েচে, সেইখানেই মেয়েদের হয়তো কিছু ব'লবার আছে। হয়তো তাদের বলা যায়, এতটা বহির্ম্মুখী না হ'য়ে জীবনযাত্রার আদর্শটাকে আরও খাটিয়ে গৃহের দিকে মন দাও। কিন্তু আমাদের কথা আলাদা। আমি যে একটু আধটু বাইরের কাজ করে উপার্জ্জনের চেষ্টা করছিলুম সেটা বেঁচে থাকবার গরজে। তারপরে দেখলাম, তোমার মনে খুব বেশি রকম আঘাত লাগছে, তাই ছেড়ে দিলাম। তেমন করে আর চেষ্টা করলামনা।"

প্রকাশ চিন্তাকুলভাবে কহিল, "আচ্ছা তোমার কথাটা ভেবে দেখি।"

খানিকক্ষণ পরে খাবারের থালার সুমুখে বসিয়া প্রকাশ বলিল, "একটা কথা তোমাকে আজ স্পষ্ট করেই বলচি শান্তা এখানের বারে

কিচ্ছু হ'বেনা।' পনের কেন পঁচিশ বছর ধরে মাথা ঠুকে মরলেও কিছু হ'বেনা। এখানে বসে বসে মাসের পর মাস বাড়ী ভাড়া গুণে আর খরচ চালিয়ে সর্ব্বস্বান্ত না হয়ে দেশের বাড়ীতে অল্প খরচে চাষ বাস করে থাকলেও শান্তিতে থাকতে পারব। নাইবা ওকালতী করলাম। 'ল পাশ করেছি বলেই যে ওকালতী করতে হ'বে তার কোন মানে নেই। বেশি উচ্চাশা নাই বা করলাম। আর আমাদের অত ভাবনাই বা কেন, একটিমাত্র মেয়ে। তার কোন রকম করে জোগাড় করে ভালো জায়গায় বিয়ে দিয়ে দেব। ধর যদি দেশের বাড়ীতে থাকি, এখনও তিনখানা হালের জমি আছে আমাদের। খুব মন দিয়ে চাষ দেখতে পারলে তার থেকে সারা বছরের ধান চাল নানা রকম কলাই তরি তরকারী জন্মিয়েও বাড়তির ভাগ বিক্রী করে কিছু লাভ করতে পারব। তারপরে ধর বাড়ী সেখানে নিজেদের আছে, বাড়ীভাড়া লাগবেনা। গাঁয়ের যাই হো'ক একটা হাই স্কুলও আছে, আমি যদি যেয়ে পাড়ি পঁচিশ ত্রিশ টাকা মাইনের একটা মাষ্টারী আমি পাবই। তাহ'লে আর ভাবনা কি, বলো? না, তামাসা নয়। এই কথাটা ক'দিন ধরে অনবরত আমি ভাবচি। কেবল তুমি কি মনে করবে, হয়তো পাগল ভাববে না কি, তাই বলতে পারিনি।"

শান্তা পাখা করিতেছিল খাবার সম্মুখে বসিয়া, কহিল, "কেন পাগল ভাবব কেন? তোমার যাতে দুশ্চিন্তা কমে, যা ভালো বোধ

কর তাই করবে।" প্রশান্ত ঠাকুরপো এই সব বুদ্ধি দিয়েচে বুঝি?

"না, প্রশান্ত আমাকে কিছুই বলে নাই। কিন্তু তার জীবনটা দেখেও আমি মাঝে মাঝে ভাবি, সে'ওতো চিরকাল সহরে মানুষ, মস্ত বড়লোকের ছেলে। জীবনে কত সুযোগই তো সে অনায়াসে পেতে পারত। কিন্তু কিসের জন্যে সে সমস্ত ছেড়ে নিজের কাজের জায়গা ঐ পাড়াগাঁয়ের মধ্যেই বেছে নিলে।"

শান্তা অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া কি ভাবিতেছিল। এখন বলিল, "ওর কথা আলাদা। প্রশান্ত চিরকালই আদর্শবাদী মানুষ। ও আদর্শের জন্যে সমস্ত ছেড়েচে। ওর মনে নিশ্চয় করে বিশ্বাস হয়েছে, আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আর উন্নতির জন্যে হাজারো চেষ্টা ক'রো যতদিন না মুমূর্ষু পল্লীগুলীর দুর্দ্দশা ঘুচবে ততদিন কিছুই হ'বেনা। সেই আদর্শ আর সেই স্থির বিশ্বাসের পাদমূলে সে সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়েচে। কিন্তু আমাদের বেলায় তো আর তা হচ্চেনা। আমরা একভাবে জীবন আরম্ভ করেছিলুম, জীবন সংগ্রামে পারলুমনা, তাই কারবার গুটিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি। এতে কোন উচ্চতা নেই, রয়েচে হেরে যাওয়ার কলঙ্ক।"

"তা কেন ভাবচ, যত দেরীই হো'ক জীবনে ভুল বুঝতে পারলেই তা সংশোধন করতে হয়। চিরকাল কি সেই ভুলকেই আঁকড়ে পড়ে থাকবে?"

শান্তা অনেকক্ষণ কিছু বলিতে পারিলনা, তারপরে মৃদুস্বরে কহিল, "আচ্ছা আমি ভেবে দেখি।"

খানিকক্ষণ পরে আবেগের সহিত বলিয়া উঠিল, "তুমি হঠাৎ এত দমে গেলে কেন ? ওকালতী ব্যবসায়ে একবার নাম খুলে গেলে কি রকম উন্নতি হয় জানো ? তখন সুদশুদ্ধ লোকসান একেবারে পুষিয়ে যায়।"

তাহার চোখে আশার জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সেইদিকে চাহিয়া প্রকাশ আর কিছু বলিলনা। একটুখানি ম্লান হাসিল মাত্র।

(১৪)

পরের দিনে অশোকাদের বাড়ীর প্রীতিসম্মিলনে যাইবার কথা শান্তার আদৌ মনে ছিলনা। নিজের জীবনের দুর্ভর চিন্তায় সে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ মোটরে করিয়া অশোকা আসিয়া হাজির। তাহাদের না লইয়া গিয়া কিছুতেই ছাড়িবেনা। যতদিন এমনই করিয়া কাটে কাটুক—শান্তা কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে ভাবিল, তারপরে অদৃষ্টের লেখা তো আর কিছুতেই খণ্ডান যাইবেনা। তা ছাড়া শোভাটাকে একটু আনন্দ দেওয়া হইবে; সে বেচারা সারাদিন বাড়ীতে একা থাকে। মোটরটা আসিয়া যখন অশোকাদের বাড়ীতে পৌঁছিল তখন সমাগত অতিথিদের আগমনে অতবড় বাড়ীটা ভরিয়া গেছে। যাঁহাদের আসিবার কথা ছিল, সকলেই আসিয়া পড়িয়াছেন। দোতালায় অশোকার ঘরে মেয়েদের বসিবার জায়গা হইয়াছিল।

মুন্সেফবাবুর, ডিপুটিবাবুর, বড় বড় উকীলবাবুদের গৃহিণীরা সকলেই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। নানা রকম গল্প গুজব হইতেছে।

মুন্সেফবাবুর স্ত্রী বলিতেছেন, "আমার মেয়ে বন্দনাকে আমি কটকের হাই স্কুলে রেখে দিয়েছি। সেখানেই আমার বাপের বাড়ী কিনা। বদলীর চাকরী হ'লে ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া শেখাবার ভারি অসুবিধে হয়। ওকে তাই ওখানেই রেখেছি। আর দু'বছর পরে ম্যাট্রিক দেবে।"

ডিপুটিবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আমার মেয়ে ইলাকে আমি লোরেটোতে ভর্ত্তি করে দিয়েছি। আজকালকার শিক্ষিত সমাজে বিয়ে দিতে হ'লে যে ধরণের শিক্ষা দীক্ষা চাই তা লোরেটো কিংবা কোন কনভেণ্টে না দিলে ঠিকটি হ'বার যো নেই।"

শান্তা চুপ করিয়া এ সমস্ত গল্প শুনিতেছিল। অদূরে শোভা বসিয়াছিল, সেইদিকে একবার চাহিয়া দেখিতেই তাহার মনটা হু হু করিয়া উঠিল। হায়রে এই সব বন্দনা ইলাদের পাশে তার মেয়ে শোভাকে কেমন লাগিবে! কোথায় লোরেটো কোথায় ম্যাট্রিক পড়া, সে বেচারার বাবা সহরে থাকিবার, সহরে থাকিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিবার খরচ আর জোগাড় করিতে পারিতেছেনা। অনেক কষ্টে অনেক টানিয়া বুনিয়া এতদিন চলিয়াছিল, আর বুঝি চলেনা।

কোন্ অবজ্ঞাত অখ্যাত পল্লীগ্রামে,—যেখানে সঙ্গ নাই শিক্ষা নাই সভ্যতা নাই সেইরূপ অন্ধকারময় স্থানে তার ফুলের মত দিনগুলি

একটি একটি করিয়া কাটিয়া যাইবে এবং তাহার পরে হয়তো কোন এক দরিদ্র পরিবারে বিনা সমারোহে বধূ হইয়া চির জীবনের মত ঘোমটা মাথায় ঢুকিবে, মৃত্যুর আগের দিন অবধি আর বাহির হইবেনা।

অথচ শোভার মত সুশ্রী আর বুদ্ধিমতী মেয়ে বড় একটা দেখা যায়না। মুন্সেফবাবুর স্ত্রী শান্তার একটু কাছে সরিয়া আসিয়া বলিলেন, "শুনলুম আপনি নাকি অশোকাকে গান এস্রাজ ইত্যাদি শেখাতেন। আচ্ছা আমার মেজ মেয়েটি আমার কাছেই থাকে, আপনার অবসর মত তাকে কি একটু শেখাতে পারেন?⋯ ধরুন এই সপ্তাহে চারদিন করে। আপনি যা নেবেন তাই দেব।"

লজ্জায় শান্তার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, "বেশতো, এ সম্বন্ধে সঠিক সমস্ত আমি বাড়ী যেয়ে আপনাকে লিখে পাঠাব।"

মুন্সেফবাবুর স্ত্রী আবার বলিলেন, "হ্যাঁ, দেখবেন, ভুলে যাবেন না যেন। অশোকারা যা দিতেন অতটা অবশ্য আমি পেরে উঠবনা। আর একটা কথা, আপনি তো আমাদের মহিলা সমিতিতে কোন মতেই যোগ দিলেন না। আমরা একটা সেলাইয়ের ক্লাস খুলেছি, সেখানে মেয়েদের নানা রকম কাটিং শেখাবার ইচ্ছা ছিল। উপযুক্ত লোক পাচ্ছিনে। কে শেখাবে, আপনি দয়া করে এই ভারটা নিন না। সমিতির সভ্যাদের কাছে কিছু কিছু চাঁদা নেব সেলাইয়ের

ক্লাসের জন্যে। তার থেকে আপনাকে আপনার পরিশ্রমের জন্য কিছু মর্য্যাদা নিশ্চয়ই দেব। ধরুন আমাদের সমিতি সপ্তাহে দু'দিন করে ব'সে, শনিবারে ও বুধবারে। সেই দুদিন আপনি যাবেন, ঘণ্টা দুই করে সেলাই শেখাবেন। সমিতির গাড়ী যাবে আপনাকে আনতে।"

শান্তা মনে মনে ভাবিতেছিল, এ ভালোই হইল যে অশোকাদের বাড়ীর কাজটা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুইটা কাজের জোগাড় হইয়া গেল।

আসিবার সময় অশোকার স্বামী আসিয়া দেখা করিলেন। অশোকাও ঘটা করিয়া বিদায় লইল। বলিল, "আপনার সঙ্গে বেশিক্ষণ গল্পই করতে পেলুম না। আমরা কাল সকাল আটটার ট্রেণে যাব, এখন রাজ্যের জিনিষ কেনা বাকী। তবু দেখুন সকাল হ'তে না হ'তেই বেরিয়েছিলাম ওঁর সঙ্গে বাজার করতে।"......

শান্তা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, তোমাদের জীবন আর আমার জীবনের মধ্যে অনেক তফাৎ। তোমাদের হাইসার্কেলের জীবন, বাজার করতে যেয়ে অবসর পাওয়া যায় না,—এইমাত্র কেবল জীবনের ট্রাজেডি।......আর আমাদের......

বাড়ী ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। শোভার পড়াশোনার দিকে আদৌ মনোযোগ দেওয়া হইতেছে না বলিয়া শান্তার মনে ক্ষোভ ছিল। আজ তাহাকে বকিয়া ঝকিয়া পড়াইতে বসিল। "কোথায় বই তোর, শ্লেট কোথায়, একটাও খাতা দেখছিনে!......"

রান্না চড়াইয়া দিয়া শ্লেটে তাহাকে একটা অঙ্ক দিয়া বসাইয়া দিল। কিন্তু সারাদিনের গোলমাল ও নিমন্ত্রণ বাড়ীর হায়রাণীতে কখন তাহার ঘুমে কাতর মুখখানি শ্লেটের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, রান্নাঘরের মাটির মেঝেতেই বই শ্লেটের রাশির মাঝখানে সে ঘুমাইয়া পড়িল। সেই দিকে চাহিয়া ক্ষুব্ধ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া শান্তা ভাবিল, বাইরের কত মেয়েকে কত কি শেখাই, কিন্তু নিজের একটিমাত্র মেয়ে তাকে কিছুই শেখাতে পারছিনে, তার প্রতি কোন কর্ত্তব্যই হয়ে উঠছে না।

(১৫)

রান্না শেষ হইয়া গেল, একটু বেশি রাত্রিতে প্রকাশ আসিল বাড়ীর ভিতরে।

শোভার দিকে দৃষ্টি পড়ায় বলিল, "একি, একে এমন করে মাটিতে শুইয়ে রেখেছ, অসুখ হয়ে যাবে যে। উপরে তুলে দিয়ে আসতে পার নি?"

শান্তা ভাত বাড়িতে বাড়িতে সংক্ষেপে কহিল, "আমার সময় হয়ে ওঠে নি। গরীবের ঘরের মেয়ের অত অল্পতে অসুখ করলে চলে না।"

প্রকাশ আর কোন কথা না বলিয়া মেয়েকে সন্তর্পণে উঠাইয়া উপরের শয়ন কক্ষে শোয়াইয়া দিয়া আসিল। মশারী ফেলিয়া,

সহরের মোহ

শিয়রের কাছের আলোটা একটু কমাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া আসিয়া বলিল,—"আমি কাল রাত্রিতে যে কথাটা ব'লেছিলাম সেটা কি ভেবে দেখেছিলে শান্তা ? অনর্থক সহরের মায়ায় পড়ে থেকে জীবনটাকে আর সকল দিক থেকে ব্যর্থ ক'রো না ; আমি বলছি, এবারে চ'লো আমরা ফিরে যাই। আমাদের ওখানকার দেশের বাড়ীর কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে, দক্ষিণ খোলা বড় বড় ঘর। সামনে খোলা জায়গা আছে, সেখানে অনায়াসে তরীতরকারীর বাগান করতে পার। আমি কাল তোমার মত না নিয়েই আমাদের গ্রামের স্কুলের সেক্রেটারীকে একখানা চিঠি দিয়েছি, যদি তাঁরা আমাকে স্কুলের হেড মাষ্টারের চাকরীটা দিতে পারেন। আমি ভাবছি, সেখানে যেয়ে জীবনের সম্বন্ধে একটা আদর্শবাদ মনে আসবে। মনে হ'বে আমি বেঁচে আছি, আর আমার দেশের কোন কাজে লাগছি। আর এখানে সকাল থেকে রাত্রি কেটে যাচ্ছে কেবল কেমন করে দুমুঠো খেতে পাব, সেই চিন্তায়। তাও যদি এ ভারটা কেবলমাত্র আমিই চালিয়ে নিতে পারতুম, তবু মনে সান্ত্বনা থাকত। কিন্তু সে সান্ত্বনাও থাকছে না। তোমাকেও যোগ দিতে হয়েছে এই জীবন যুদ্ধে। এই বিষম পরিশ্রমে তোমার মনের সুখ গেল, আনন্দ গেল, শান্তি গেল। তবুও কিসের নেশায় আর সহরে পড়ে থাকতে চাও শান্তা ?"

"তুমি আঁমার বিষয়ে জানলে কেমন করে? আমার কথা আমিই জানি।"

"সমস্তটা না জানতে পারি, কিন্তু কিছু কিছু আন্দাজও তো করতে পারি। এই মাত্র এসে দেখলাম শোভা কিছু না খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। তোমাকে জিজ্ঞেস করে জবাব পেলুম, সময় নেই। সময় নেই সত্যিই। তোমার সমস্ত সময় বাঁধা পড়েচে অর্থ সংগ্রহের মর্ম্মান্তিক প্রয়োজনের কাছে। সে প্রয়োজনের দয়া নেই, মায়া নেই। সংসারের সব সুখ ভেসে গেলেও তার দাবী মেটাতেই হ'বে।"

শান্তা একটুখানি ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা আরও ছ'মাস সময় তুমি নাও, আর আমাকেও দাও। যদি এসময়ের মধ্যেও আমাদের সংসারের শোচনীয় অবস্থা এমনই থাকে, তাহ'লে আর আমি আপত্তি করবনা তোমার ব্যবস্থায়। তুমি যা বলবে তাই হ'বে।"

প্রকাশ আর কিছু বলিলনা, একটুখানি হাসিল মাত্র। হায়রে আশা……

"হাসলে যে?"

"হাসলাম এই মনে করে যে, মানুষের আশারও আর অন্ত নেই। ধর এই আমারই কথা। লেখাপড়ায় বরাবর ভালো ছিলুম, বৃত্তি পেয়ে পাশ করেছি। ওকালতী পাশ করলুম। সবাই আশা করলে অচিরেই যথেষ্ট উপার্জ্জন করে সংসারে দশজনের একজন হ'ব। কিন্তু

কোথায় আমার কর্ম্মক্ষেত্র বলতে পারো শান্তা? সে কোন্ দেশে? আমাদের এই সহরে দু'শো উকীল বেকার বসে রয়েচে। তারা দুপুর বেলায় বারলাইব্রেরীতে বসে পরচর্চ্চা করে ঘুমে ঝিমোয়, তাস খেলে। আদালত ভাঙ্গবার সময় হ'লে বাড়ী ফিরে যায়। আট আনা একটাকা ফীয়ে কাজ করবার জন্যে কত উকীল লালায়িত। যে দেশে জীবিকার জন্যে সহ্য করতে হয় এত দুর্গতি এত লাঞ্ছনা সে দেশ যদি পরাধীন না থাকবে তবে পরাধীন থাকবে কে বলতে পারো?—নিজের বিষয়ে আমি একটুও বাড়িয়ে বলিনি শান্তা, তুমি অবশ্যই মনে করতে পারো আমি নিজের অযোগ্যতার ভার দেশের নাম করে আর কারো ঘাড়ে চাপাতে চাইছি, নিজের ক্ষমতা নেই তাই পারছিনে কিন্তু করতে কেবল বড় বড় কথার ফাঁদ পেতে আত্ম-রক্ষা করছি, কিন্তু তা নয়। নিজের সম্বন্ধে আমি আর কিছু না বলি এইটুকু কেবল বলতে পারি, আমার ছিল সেটুকু ক্ষমতা যাতে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থেকে কারো প্রতি অন্যায় না করে জীবিকার প্রয়োজন চালিয়ে নিতে পারি।"

শান্তা ধীরস্বরে বলিল, "পারবে পারবে, নিশ্চয় পারবে। স্বাধীন ব্যবসা মাত্রেই ধৈর্য্য দরকার। তুমি ধৈর্য্য ধরে আরো কিছুদিন চেষ্টা করে দেখনা কি হয়। অত তাড়াতাড়ি কিছু একটা করে ব'সনা। আমিতো বলেছি অন্ততঃ আর ছ'মাস তুমি আমাকে সময় দাও, ইতিমধ্যে দেখ কি হয়।"

(১৬)

শান্তা রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে শুইয়া শুইয়া ভাবে, আর কিছু-দিন পরে যদি সত্যই এখানকার খরচ না চলে তবে কেমন করিয়া কি ভাবে তাহাদের জীবনযাত্রার ধারা পরিবর্ত্তিত হইবে স্বামীর কথামত সেই কোন্ একটা অজ পল্লীগ্রামের রঙ্গমঞ্চে তাহাদের জীবনের পট আবার কী নূতন ভাবে উত্তোলিত হইবে। পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে তাহার চিরদিনকার বিভীষিকা আছে। সেখানে স্বাস্থ্য নাই সঙ্গ নাই শিক্ষা নাই,—সেখানে গিয়া একটা দিনও সে বাঁচিতে পারিবেনা। আসন্ন দুর্গতির এই ছবিটা যতই তাহার মনশ্চক্ষুর সামনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল ততই তাহার সমস্ত মন ভরিয়া একটা হাহাকার উঠিতে লাগিল।

নিজের ভাগ্যর উপরে বিরূপ ভাগ্যবিধাতার উপরে অভিমানে তাহার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল; এইতো তাহার আর সব বোনেদের বিবাহ হইয়াছে কাহারো কলিকাতায় শ্বশুরবাড়ী, কাহারও স্বামী দিল্লী সিমলায় ছ'মাস অন্তর বদলী হইয়া লাটের দপ্তরে কাজ করে। তাহাদের জীবন যাপিত হইতেছে সহরের আওতায়, আলোকমুখর সুন্দর সভ্য আসঙ্গে! আর সেইবা এমন কি দোষ করিয়াছিল যাহাতে আজন্মের শিক্ষা এবং রুচি বিসর্জ্জন দিয়া তাহাকে কোন এক অজ্ঞাত পল্লীতে গিয়া বনবাস করিতে হইবে।

না না, যেমন করিয়া হো'ক এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শান্তা বিদ্রোহ করিবেই। নিজের শক্তিতে অবিশ্রান্ত খাটিয়াও সে খরচ যোগাড়

করিবে। কে বলিতে পারে, একদিন হয়তো তাহার স্বামীর ভাগ্য খুলিয়া যাইতে পারে। কেবল ধৈর্য্য দরকার। ধৈর্য্যের সঙ্গে সুদিনের অপেক্ষা করিয়া জীবন সংগ্রামে ক্ষান্ত না হওয়া। এমন করিয়া পরাজয়ের কলঙ্ক সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া সে চিরদিনের জন্য একটা শিক্ষা সভ্যহীন পাড়াগাঁয়ে নির্ব্বাসিত করিতে পারিবেনা। তা ছাড়া শোভার কথাটাও ভাবিতে হইবে। তার বিকচোন্মুখ জীবনেরও একটা দাম আছে।

* * * *

তারপরে ধৈর্য্যের তাহার অসহনীয় পালা সুরু হইল। ভোরে উঠিয়া যাবতীয় গৃহকাজ সারিয়া শান্তা সেলাইয়ের কল লইয়া বসিত। রান্নাটা কোনক্রমে সারিয়া স্নানাহারের পালা চুকাইয়া বেলা বারোটা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত কলে সেলাই করিত। তারপরে উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া মুন্সেফবাবুর বাড়ীতে তাঁহার মেয়েকে সেলাই এবং এস্রাজ শিখাইতে যাইত। ফিরিয়া আসিয়া আবার সেলাই লইয়া পড়িত। তারপর প্রকাশ আদালত হইতে ফেরত আসিত, শোভা স্কুল হইতে আসিত। শোভাকে মাসখানেক হইল একটা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছে। চা জলখাবার তৈয়ারী করিয়া দিয়া তাহাদের খাওয়াইয়া, ঘরদুয়োর ঝাঁট পাট দিয়া বিছানা পাতিয়া, সন্ধ্যা দেখাইয়া আবার

বাহির হইত ডিপুটিবাবুর মেয়েকে ইংরাজী ও গান শিখাইতে। ফিরিয়া আসিয়া সংক্ষেপে রান্না বান্না সারিয়া লইত। আজকাল সারাদিনের খাটুনির পরে রাত্রিবেলায় আবার ভাত রান্না করিতে ইচ্ছা হইতনা। খানকতক রুটি গড়িয়া লইত, একটা তরকারী। যেদিন খুব গরম পড়িয়া যাইত সেদিন একটা ইকমিককুকার কিনিয়াছিল তাহাতেই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রান্না সারিয়া লইত। রাত্রির খাওয়া দাওয়া সাঙ্গ হইয়া গেলে ঘর নিকাইয়া উচ্ছিষ্ট পাত্র-গুলা ধুইয়া মুছিয়া সমস্ত কাজ যখন শেষ হইত তখন শ্রান্তির ভারে অবসন্ন শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায় যেন। বিছানায় পড়িবামাত্র ঘুমে অচেতন হইয়া যাইত। সমস্ত রাত্রিটা কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটিয়া যাইত, কখন ভোর হইত, ভোরের আলো চোখে লাগিবামাত্র চিরকালের অভ্যাসমত নিদ্রাজড়িত চোখের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, ধড়ফড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াই মনে পড়িয়া যাইত সারাদিনের কর্ম্মতালিকা। তখনও পাশের বিছানায় প্রকাশ শোভা নিশ্চিন্ত সুষুপ্তির বিশ্রামে মগ্ন। কন্যা বা স্বামীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিবারও অবকাশ হইতনা। ইচ্ছাও হয়তো হইতনা। জীবনটা একটা রুটিনের মত হইয়া উঠিতেছিল ক্রমশঃ। স্বাদ নাই, গন্ধ নাই। কেবল সূর্য্যোদয় হইতে সুরু করিয়া সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দিনটাকে ঠেলিয়া পার করিয়া দেওয়ামাত্র।

ইতিমধ্যে এই আনন্দহীন গৃহস্থালীতে একটুখানি বৈচিত্র্য দেখা

হয়না। একটা না একটা পথ যেমন করিয়া হো'ক আবিষ্কৃত হইবে। এ আশা তাহার কোনমতে যাইবার নয়। এই নিরন্ধ্র অন্ধকারের মাঝে ভগবান একটু আশার আলো নিশ্চয়ই জ্বালিয়া দিবেন।

সন্ধ্যা বেলায় একটা ভালো ছবি ছিল টকিতে, তাহাই দেখিয়া ফিরিবার পথে কথা হইতেছিল। শান্তা মুগ্ধ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "কী চমৎকার! সত্যি যারা কলকাতার মত এমন একটা কালচার্ড, ইন্‌টেলেকচুয়্যাল সেণ্টারে থাকতে পায় তাদের কী সৌভাগ্য!"

প্রশান্ত বলিল, "বৌদি' আপনি ক্ষেপে গেলেন নাকি? এই টকি আর ট্রাম বাস দেখে আপনি এতটা মুগ্ধ হয়ে পড়বেন ভাবি নাই।"

"তা মুগ্ধ কেন হ'বনা ভাই। সাত আট বছর কলকাতায় আসি নাই। যখন বিয়ের আগে এখানে ছিলাম তখন এত চমৎকার টকি হয় নাই, এখন দেখছি গান, হাসি, কথার আওয়াজ, সমস্তই একেবারে স্বাভাবিক নিখুঁত। আর আর্টের দিক থেকেও খুব উচ্চশ্রেণীর।"

শোভা একবাক্স চকোলেট হাতে অবাক নয়নে রাস্তার দু'পাশের আলোকজ্জ্বল প্রাসাদমালার দিকে চাহিয়াছিল। বলিল, "এত সুন্দর কাকাবাবু। আমি তোমার সঙ্গে আবার কাল যাব। আমায় নিয়ে যাবে তো?"

প্রশান্ত একটু যেন অন্যমনস্ক হইয়া বলিতে লাগিল, "আপনা

মত যথার্থ শিক্ষিত মনের কাছেও যে কেবলমাত্র সহরের মোহটাই প্রবল হ'বে এ আমি সত্যি ভাবতে পারি নাই ভাই শান্তা বৌদি'। তবে আমার মনে হয় এটা স্বাভাবিক নয়। আপনার মনের একটা অস্বাভাবিক অবস্থামাত্র।"

"তোমার কথার মানে বুঝতে পারছিনে ভাই।"

"বলছি। কাল রাত্রে প্রকাশদা' তাঁর একটা গোপন সঙ্কল্পের কথা আমাকে বলছিলেন। খুব সম্ভব আপনাকেও বলেছেন। সহরে বসে ওকালতীতে পসার জমাবার নিরর্থক প্রয়াসে আপনার এবং তাঁর শরীর মনের সুখ শান্তি নষ্ট না করে তিনি তাঁর দেশে ফিরে যেতে চান। সেখানকার স্কুলের হেড মাষ্টার তিনি অনায়াসে হ'তে পারেন, কারণ খবর পেয়েছেন যিনি হেড মাষ্টার ছিলেন তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বার্দ্ধক্যের জন্য অনবরত ভুগছেন। আর কাজ করতে পারবেননা বলে অবসর নিয়েছেন। এসময়ে তাঁকে যদি পায় ওরা সাগ্রহে নেবে। প্রকাশদা' ওখানকারই ছেলে। ছেলে বেলা থেকেই তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি সবাই জানে ওখানকার।' জানিনা এ সম্বন্ধে আপনার কি মত; কিন্তু আমার মনে হয়, তা যদি হয় তাহ'লে তো আপনাদের পক্ষে খুব ভালোই হ'বে।"

শান্তাদের ভাড়াটে ট্যাক্সিটা তখন হোয়াইটওয়ে লেড্‌লার বিরাট সৌধশ্রেণীর সামনে দিয়া যাইতেছিল। চক্ষের নিমেষে এই মহানগরীর আলোকময় জনতা শান্তার চোখের সামনে ছায়াছবির

মত অস্পষ্ট অন্ধকার হইয়া আসিল। দারুণ একটা ভয়ে তাহার এতক্ষণকার সকল আনন্দ নিভিয়া আসিল। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "একথা তিনি তোমাকেও বলেছেন তা আমি জানতুমনা। ওঁর মাথায় কিযে সব মাথা মুণ্ডু প্ল্যান আসে বুঝতে পারিনে। আচ্ছা শান্তঠাকুরপো ওঁর ঐ স্কুল মাষ্টারির মাইনে কত?"

"প্রকাশদা' বলছিল উপস্থিত ভয়ানক আর্থিক দুর্গতির জন্যে আপাততঃ ওরা পঞ্চাশ টাকা দেবে। পরে আরও কিছু বাড়তে পারে, বেড়ে ষাট সত্তর হ'তে পারে।"

"তবে?"

"তবে কি?"

"সারা জীবনে ঐ পঞ্চাশ টাকার ঊর্দ্ধে মনের উচ্চাশা উঠবেনা। শিক্ষা সভ্যতাহীন একটা পাড়াগাঁয়ে পঞ্চাশ টাকার জন্যে জীবনটাকে বাঁধা দিতে হ'বে! এতে তোমার মত আছে নাকি?"

"কেন নন্দ কোন্‌খানটায় আমি তো ভেবে পাচ্ছিনে। সেখানে আপনার শ্বশুরের আমলের পাকা বাড়ী আছে নিজেদের, দু'খানা হালের কিছু জমিও আছে। বাড়ীভাড়া লাগাবে না, চাল কিনতে হ'বে না। বাগানে শাকসব্জী তরীতরকারী লাগাবেন। পুকুরের মাছ পাবেন, খরচ আর কি হ'বে? তা'ছাড়া কেবল আপনাদেরই যে সুবিধে হ'বে, এমন নয়। আপনাদের মত শিক্ষিত সহৃদয়,

উদার প্রতিবেশী পেলে পাড়াগাঁয়ের লোকগুলোর কত উপকার হ'বে সে কথাটাও একবার ভেবে দেখবেন।"

"অর্থাৎ কলে কৌশলে এই কথাটাই তুমি বলতে চাও যে, আপনারাও আমার মত দেশ উদ্ধার কাজে ব্রতী হ'ন। কিন্তু শান্ত ঠাকুরপো তোমার আর সবই আমি বুঝতে পারি কেবল এইটে পারিনে, দেশের কাজ বলতেই তুমি পাড়াগাঁয়ের কথায় শতমুখ হয়ে ওঠ। পল্লীগ্রামের অহরহঃ স্তুতি করা ছাড়া দেশের কাজের আর কি অন্য কোন মানে নেই? না আর অপর কোন পথ নেই।"

"নেই-ই তো। মহাত্মাগান্ধী একথাটা অনেকদিন পরে বুঝলেন। তবে ভরসার কথা তিনি মহাকায় পুরুষ, তাঁর পদক্ষেপ বিরাট। তার অসীম দ্রুতগতিতে তিনি মাঝখানকার ফাঁক অচিরে পুরিয়ে নেবেন। কেন আপনি কি শোনেন নি আজকাল তিনি অন্য সকল কাজ ছেড়ে ভারতবর্ষের এইসব মুমূর্ষু পল্লীর প্রাণ আবার কেমন করে বাঁচিয়ে তোলা যায়, কেমন করে জ্ঞানে, কর্ম্মে, স্বাস্থ্যে তাদের আনন্দময় করে তোলা যায়, সেই চেষ্টাতেই অহর্নিশি নিযুক্ত আছেন।"

এমন সময়ে মোটরটা প্রশান্তদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কথাবার্ত্তার সূত্র কাটিয়া গেল। তারপরে খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে যে যাহার ঘরে গিয়া বিশ্রামে রত হইল। কিন্তু

নিজের শয্যায় শুইয়া শান্তার বিনিদ্র নয়নে কিছুতেই ঘুম আসিল না। আপন মনেই তার মন কত না প্রশ্নোত্তরের মালা গাঁথিয়া চলিল। মহাত্মা গান্ধী বিরাট পুরুষ, বিরাট তাঁহার সাধনা। ভারতের মৃতপ্রায় পল্লীর সঞ্জীবনে তিনি মনপ্রাণ ঢালিয়া দিতে পারেন। কিন্তু শান্তার সঙ্গে তাহার কি সম্পর্ক ?

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সে বিরাট রূপও তাহার কল্পনাতে নাই, সে সকল কোনদিন সে একমনে ধ্যানের মত করিয়া ভাবেও নাই! সাধারণ ঘরের সে সাধারণ ঘরণী। ছোটবেলা হইতে কলিকাতায় মানুষ। বরাবর জানিয়া আসিয়াছে পাড়াগাঁয়ের ম্যালেরিয়া ভীতি। সেখানে বেণুবনের সর্ সর্ শব্দ, সন্ধ্যা হইতে না হইতেই ঝোঁপে ঝাঁপে শেয়াল ডাকিতে আরম্ভ করে, ঝিঁঝিঁ-পোকা ছাড়া আর অন্য কোন মানুষের সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। পানা-পুকুরের পচা জল হইতে ভাপসা গন্ধ ওঠে। এই আতঙ্কগ্রস্ত দৃশ্যের মাঝখানে নিজের অদূরবর্ত্তী জীবনকে নামাইয়া আনিয়া দেখা তাহার পক্ষে মোটেই আনন্দজনক নয়। দেশের মহিমোজ্জ্বল আদর্শের স্বপ্ন কিছু তাহার মন হইতে এই আতঙ্ক দূর করিতে পারিবে না।

(১৭)

সকাল বেলায় চায়ের টেবিলে প্রশান্তর চাকর আসিয়া দুই তিন খানা খবরের কাগজ দিয়া গেল। একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া পড়িতে পড়িতে প্রশান্ত তন্ময় হইয়া গেল। তাহার মুখাবয়বে ধ্যানের নিবিড়তা, চোখের দৃষ্টিতে আত্মবিস্মৃত গভীরতা।

শান্তা প্রশ্ন করিল, "ব্যাপার কি ঠাকুরপো? খবরের কাগজের মধ্যে এমন কি বস্তুর সন্ধান পেলে?"

"তুমিও পড়না। আচ্ছা আমিই পড়ে শোনাচ্ছি, এই লক্ষ্ণৌয়ের কংগ্রেসে নিখিল ভারত প্রদর্শনীর উদ্বোধন উৎসবে মহাত্মাজী কী সুন্দর কথাগুলি কতই না সহজে কত বিনা আড়ম্বরে বলেছেন। তিনি বলছেন, হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের অধিকাংশই জীবন যাপন করে গ্রামে, সহরে নয়। অথচ আজ যাঁরা এখানে সমবেত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে দু'একজন ছাড়া হয়তো আর কেউ জানেনা পর্য্যন্ত যে গ্রামবাসীরা কি অবস্থায় আছে। একবেলার অধিক তাহাদের আহারের সংস্থান হয়না। কিন্তু এই মৃতকল্প অবস্থার মধ্যেও গ্রাম-বাসীদের জীবন কত সম্ভবনাময় এই প্রদর্শনীতে তার কিছু ক্ষীণ পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।......"

"কই দেখি," প্রকাশ তাহার হাত হইতে কাগজখানা টানিয়া নিয়া পড়িতে লাগিল। পড়া শেষ হইলে বলিল, "মহাত্মাজী ঠিকই বুঝেছেন। এই জন্যেই গত বোম্বাই কংগ্রেসের পর থেকে তিনি

স্বেচ্ছায় সমস্ত রাজনীতি প্রসঙ্গ থেকে অবসর নিয়ে পল্লীর কাজে নিজেকে ঢেলে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে সাধনামগ্ন যোগীর মত তাঁর এই লক্ষ্য সিদ্ধির দিকে একাগ্ররূপে চিত্ত নিবিষ্ট করেছেন।”

শান্তা এ সকল আলোচনায় যোগ না দিয়া নির্লিপ্ত চিত্তে চায়ের পেয়ালাগুলা পূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল, এখন বলিল, “আমি সাধারণ মানুষ, আমি ধ্যানমগ্ন যোগীও বুঝিনে, তপস্যাও বুঝিনে। নিজের জীবনের লাভ লোকসান খতিয়ে বুঝে দেখতে আগে অভ্যস্ত হয়েছি। আমি বলছি, তোমরা আমার কানের কাছে যতই ঢাক পেটাতে থাক আমি কিছুতেই তোমার খেয়ালের বশে সারাজীবন একটা অজ পাড়াগাঁয়ে যেয়ে কাটাতে পারবনা। কেন যাব? কিসের জন্যে যাব? তোমরা কি মনে করেছ?……” অবরুদ্ধ আবেগের বশে তাহার অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। নিজেকে সম্বরণ করিতে সে আর কোন কথা না বলিয়া মুখ নীচু করিল।

প্রশান্ত ধীরস্বরে বলিল, “বৌদি’ আপনি একটু ভুল বুঝছেন। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রকাশদা’ কখনই কিছু করবেননা। আমি শুধু একটা কথা ভাবছিলুম, আমি সারাজীবন প্রচার কার্য্য করে যা না করতে পারতুম, আপনারা যেয়ে যদি কেবল পল্লীগ্রামে স্থায়ীভাবে বাস করতেন তাহ’লে তার চেয়ে বেশি কাজ হো’ত। ধরুন প্রকাশদা’, স্কুলের মাষ্টারিটা নিলে কত ছেলে তাঁর সংস্পর্শে আসত, তারপরে আপনারা দু’জনে সেখানে ঘর সংসার পাতলে আপনাদের

স্বাস্থ্যবিধি, সৌন্দর্য্যজ্ঞান, শিক্ষানুরাগ অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে কত সংসারকে পরিবর্ত্তিত করে দিতে পারত। কিন্তু তা হ'বার নয়। মনে করবেন না আপনাকে আমি বিন্দুমাত্র দোষ দিচ্ছি। এমনই হয়। যারা শিক্ষিত, মার্জ্জিত, ভদ্র, রুচিজ্ঞানসম্পন্ন, যাদের উপস্থিতি মাত্র পাড়াগাঁয়ের আবহাওয়াকে উন্নত করতে পারত, তারা কেউ সেখানে থাকেনা। থাকতে পারেনা। সে ত্রিসীমানা ছাড়িয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দিগদিগন্তে পালিয়ে যায়। তারপর আর একবারও সেদিকে পিছন ফিরে তাকায়না। এইটেই হয়েছে সব চেয়ে বড় অভাব আর সকলের চেয়ে সমস্যা। যদিও বারংবার বলতে ভরসা পাচ্ছিনে কিন্তু সেখানে গেলে কিছুদিন থাকলে বুঝতে পারতেন, যতটা ভীতির বস্তু মনে করে আঁৎকে উঠ্‌ছেন অতটা ভয় পাবার কিছুই নেই। কাকাবাবুর বাড়ীতে প্রকাশদা'র সঙ্গে তাদের দেশে আমি কয়েকবার গিয়েছি। আপনার শ্বশুর যে বাড়ী করেছেন খুব স্যানিটারি বাড়ী। প্রকাণ্ড উঁচু ভিত্তির উপরে। চারিদিকে খোলা জায়গা—ঝোপ ঝাড় কিছু তখন ছিলনা। ওখানে ম্যালেরিয়া খুব কম। আজকাল শুনছিলুম ওখানে গোটা দুই তিন টিউব ওয়েল হয়েছে, সেই থেকে খাওয়ার জল আর কেউ অন্য জায়গার ব্যবহার করেনা, ওখান থেকেই নেয়। বোধ হয় সে কারণেও খানিকটা কমে গেছে।"

শান্তা প্রসঙ্গান্তরে যাইবার জন্য বলিল, "কই ঠাকুরপো আজ যে সকাল বেলায় আমাকে সঙ্গে নিয়ে নারীশিক্ষা সেবা সমিতি দেখিয়ে আনবে বললে, তার কী হো'ল। বেলা তো ক্রমশঃ বাড়ছে।"

"আপনি তৈরী হ'য়ে আসুন, আমি এখনই যাচ্ছি। কোনও আপত্তি নেই।"

শান্তা কাপড় বদলাইয়া তৈরী হইবার জন্য উঠিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

(১৮)

শান্তার ভাগ্যবিধাতা ক্রমশঃ বিরূপ হইয়া উঠিতেছেন। যাহা সে একান্ত মনে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে চায়, যে বস্তুর চিন্তামাত্র তাহার কাছে অত্যন্ত ভীতিকর অবশেষে তাহাই কি তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে! কলিকাতা হইতে ফিরিবার আগে কলিকাতাতেই তাহার ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছিল। ইনফ্লুয়েঞ্জা সারিল বটে কিন্তু দুর্ব্বলতা আর যাইতে চায়না। সমস্ত কাজ কর্ম্ম ওঠা বসার ভিতরে ভিতরে কি এক দুর্ব্বিসহ ক্লান্তি টানিয়া ফিরিতে হয়। মনে হয় যেন রোজ ভোর বেলায় জ্বর আসে। সেদিন মহিলা সমিতিতে সেলাই শিখাইতে যাইবার দিন ছিল। ফিরিয়া আসিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া শান্তা আর দাঁড়াইতে পারেনা। ঘরের চৌকাটের উপর কপাটে মাথা রাখিয়া বসিয়া পড়িল। তখনও কোন ঘরে আলো জ্বালানো হয় নাই, অন্ধকারের মধ্যে প্রকাশ

আসিয়া বাড়ীতে ঢুকিল। শোভা ভয় পাইয়া বলিল, "মায়ের অসুখ করেছে বাবা, উঠতে পারছেনা।"

"আচ্ছা আমি দেখছি, তুই চট করে একটা লণ্ঠন আনতো দেখি। আমি জ্বেলে নিই।" শোভা দৌড়িয়া একটা আলো আনিল।

আলো জ্বালিয়া সেই আলোতে শান্তার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া প্রকাশ হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। এ মুখে স্বাস্থ্যের আলো যেন একে-বারে নিভিয়া গেছে। কোন অরন্তুদ অবসাদ মুখের কালিমায় ঘন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। এতদিন লক্ষ্য করে নাই বলিয়া সে আপনাকে আপনি ধিক্কার দিল। অর্থের তাড়নায়, উপার্জ্জনের তাগিদে সারাদিন চকিত উদভ্রান্তের মত কাটিয়া যায়, কোথায় কোন কোণে ঘরের দীপশিখা মুমূর্ষু হইয়া আসিয়াছে সেদিকে তাকাইবার অবসর মেলে নাই। কিন্তু এবারে যখন দৃষ্টি পড়িল তখন যেমন করিয়া হোক এই শ্রান্ত ক্ষীণ নারীকে জীবন সংগ্রামের দায় হইতে নিষ্কৃতি দিতেই হইবে।

শান্তাকে আস্তে আস্তে ধরিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া বলিল, "তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর। আর মনে কর এখন থেকে তোমার আর কোন কাজই করবার নেই। সংসার চালাবার ভার বা যে কোন ভারই হো'ক আমি হাতে তুলে নিলাম। ভালো হো'ক মন্দ হো'ক যেমন করে একরকম করে চলবে। না যদি চলে সে

ভাবনাও আমার মাথায় তুলে দাও। তুমি শুধু মনে কর তোমার ঘুমোন আর বিশ্রাম করা ছাড়া কোন কাজ নেই।"

শান্তা একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা। আর আমি ভাবনা করেই বা কি করব আমার ক্ষমতা নেই। ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবেই। আমি এত চেষ্টা করেও তো তা ঠেকাতে পারলুমনা।"

প্রকাশ দেশে চিঠি লিখিতে বসিল। তাহার যে বিধবা পিস্তুত বোনটি দেশের ভিটায় থাকিত, তাহাকে লিখিল, "সোমবার সকালের ট্রেণে আমরা যাচ্ছি। তুমি সমস্ত বন্দোবস্ত করে রেখ। খানিকটা দুধ জোগাড় করে রাখবে। আর ষ্টেশনে একখানা পাল্কী কিংবা নেহাৎ যদি না পাও একজোড়া ভাল গরুর গাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা করবে।"

(১৯)

শান্তার মানসিক অবস্থা পল্লীগ্রামের বিরুদ্ধে এমনই বাঁকিয়া বসিয়াছিল যে, সে এ ঘটনাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিলনা। জীবনযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ক্লান্ত সৈনিক যেমন করিয়া ভগ্নোৎসাহে পিছু হটিয়া যায় তেমনই অলস মন্থর গতিতে সে এই দুর্ভাগ্যকে গ্রহণ করিল।

তাহারা গ্রামের ষ্টেশনে যখন পৌঁছিল তখন বেলা পাঁচটা হইবে। অস্তোন্মুখী সূর্য্যের কিরণ স্নিগ্ধ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রাবণ

মাসের বর্ষার জল ক্ষেতে জমিয়াছে, ধানের ক্ষেত্রে সবুজের হিল্লোল তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছে। মাথার উপর প্রকাণ্ড আকাশ, চারিদিকে অবারিত মাঠ ঘাট। ভিজা মাটির একটা অপূর্ব্ব গন্ধ। বর্ষার্দ্র প্রকৃতির একটা সজল বিপুলতা, সে অবাক হইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। এমন আগে কখনও দেখে নাই। বাড়ীতে পৌছিবামাত্র বিধবা পিস্তুত ননদটি যথাসাধ্য আদর যত্ন করিয়া তাহাদের গ্রহণ করিল। এখানে যেন জীবনের চিন্তা বা অভাব বলিয়া তেমন কোন জিনিষ নাই। চারিদিকেই প্রচুরতা। বাড়ীতে গরু আছে। শোভা দুধ খাইয়া সকালে উঠিয়া বাবার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সমস্ত দেখিতে গেল। রৌদ্রে পিঠ দিয়া শান্তা বাইরের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়াছিল। এখন জানেনা এই নূতন অপরিচিত জায়গায় জীবন তাহাদের কেমন করিয়া কাটিবে। কোন্ পথে তাহার গতির ধারা বহিয়া চলিবে।

একটা জিনিষ সে লক্ষ্য করিয়াছে এখানে আসিয়া তাহার স্বামীর মনের আনন্দ যেন শতগুণ বাড়িয়া গেছে। সেই অকাল বার্দ্ধক্যের বলি রেখাঙ্কিত চিন্তাক্লিষ্ট পসার বিহীন উকীল সহসা কোন মন্ত্রবলে নব যৌবনের তারুণ্যে স্নান করিয়া উঠিয়াছে। তাহার সামনে মক্কেলহীন দিন নাই, বাড়ীভাড়ার টাকা মিটাইবার ভীষণ চিন্তা নাই। এই রাজধানীর একছত্র রাজা সে। দলে দলে স্কুলের ছেলেরা ভীড় করিয়া আসিতেছে। এই প্রিয়দর্শন প্রিয়ভাষী সহৃদয় লোকটি

তাহাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইবে শোনা অবধি তাহাদের উৎসাহের আর বিরাম নাই।

প্রকাশও সারাদিন তাহাদের সঙ্গে সমানে গল্প করিতেছে। নানা বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে। কেমন করিয়া নূতন ধরণের প্রণালীতে সে পড়াইবে ঠিক করিয়াছে, একটা ডিবেটিং ক্লাব করিতে হইবে, লাইব্রেরীতে কি কি নূতন বই আনানো চাই বার বার তাহার ফর্দ্দ প্রস্তুত হইতেছে। এসকল কল্পনার বাস্তব পরিণতি হয়তো সময়সাপেক্ষ হয়তো তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে অনেক বাধা কাটাইয়া উঠিতে হইবে, কিন্তু উৎসাহের প্রবল জোয়ারে ছাত্র বা শিক্ষক কাহারো সে কথা মনে হইতেছেনা। দুই পক্ষই ছেলে-মানুষের মত উৎসাহ সহকারে নিজেদের মতামত আলোচনা করিয়া চলিয়াছে।

প্রকাশ জীবনে এমন আনন্দ অনেকদিন পায় নাই। পরীক্ষা পাশের তাড়া প্রাণপণে পড়া মুখস্থ করিয়া পাশ করিবার ধান্দা শেষ হইতে না হইতেই ওকালতীর বাজারে তকমা আঁটিয়া ধড়াচূড়া পরিয়া নিত্য যাওয়া আসা করিতে সুরু হইয়াছিল। ভাগ্যলক্ষ্মীর বিমুখ দুয়ারে মাথা ঠুকিয়া আর সংসারের বোঝাটা কায়ক্লেশে কোন প্রকারে বহন করিয়া চলিবার দায় ঘাড়ে লইয়া ভাবনায় ভাবনায় সে যখন বুড়া হইয়া উঠিয়াছিল, জীবনের আনন্দ বলিয়া কোন জিনিষ যে সংসারে আছে তাহা ভুলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল সেই সময়ে

আপন গ্রামের শান্তির নিভৃত কোলে ফিরিয়া আসিয়া গ্রামের ছেলে বুড়ো ছাত্র অছাত্র সকল সম্প্রদায়ের কাছ হইতে এমন মনখোলা অভ্যর্থনা পাইয়া তার মনের উৎসাহ যেন শতগুণে বাড়িয়া গেল। একটা কিছু গড়িয়া তুলিবার আনন্দ মানুষের জীবনের প্রবলতম আনন্দ। এখানে অনেকের উপর তাহার আধিপত্য। অনেক তরুণ বিকচোন্মুখ ছাত্রের মন তাহার দিকে উন্মুখ হইয়া আছে সেই সব মন সে নিজের আদর্শ মত গড়িয়া তুলিতে পারে। মনের উপরকার মেঘ কাটিয়া গেছে, যতদূর দেখা যায় আকাশে জ্যোৎস্না ভাসিতেছে।

(২০)

শান্তার এখানে অনেক অবসর। কিন্তু হাতের কাজে বরঞ্চ সময় কাটিত ভালো এখন কাজ নাই মনের ভাবনা বাড়িয়াছে। বাইরে অভিযোগ করিবার কিছুই নাই। সকাল হইতে অর্থের চিন্তায় উদভ্রান্ত হইতে হয়না, খাটিয়া খাটিয়া শরীরকে আধমরা করিয়া তুলিতে হয়না, তবুও মনটা হায় হায় করিতে থাকে। হায়রে কোথায় গেল সব উচ্চাশা, সমস্ত বাসনা কামনার জের। অবশেষে সমস্তই কি আসিয়া মিটিল এই পঞ্চাশ টাকার স্কুল মাষ্টারীতে। উঠিতে বসিতে স্বামীকে এজন্য কথা শুনাইতে লাগিল, "কে জানত' জীবনটা

এমনই ভাবে যাবে, যখন প্রথম তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'য়েছিল।"—স্ত্রীর গলার এই সুরকে প্রকাশ চিনিত।

বইয়ের পাতা হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, "কেন এতদিনই বা কি সুখে ছিলে আজ এমন কথা বলছ শান্তা?"

"সুখে না থাকতে পারি, কিন্তু সুখের আশা ছিল, এখন আর তা'ও রইলনা।"

"সুখ মানে তুমি কি বোঝাতে চাও বুঝতে পারছিনে। আচ্ছা এখানে তোমার অসুখটা কোন্‌খানে? তুমি কি মনে কর এখানে থাকলে তোমার মেয়ের শিক্ষা দীক্ষা হ'বেনা, না তাকে ইংরেজী হাই স্কুলে কিংবা লরেটো ডায়সেসনে না পড়ালে তার যথার্থ শিক্ষার পথে কিছু বাধা হ'বে?"

"আমি জানিনে—" শান্তা মুখ ভার করিয়া মাঝ পথে থামিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, "এখন তো নাচছ, এর পরে যখন ম্যালেরিয়াটি সুরু হ'বে তখন এত ফূর্ত্তি বেরিয়ে যাবে।"

"তার ব্যবস্থা আমরা এখন থেকেই করব ঠিক করেছি। স্যানিটারি ইনস্পেকটরের কাছে আমাদের দরখাস্ত গেছে, দু'শো টাকা মঞ্জুর হয়েছে এ বছরের জন্যে। বর্ষার আগে সমস্ত ঝোপ ঝাড় জঙ্গল কেটে সাফ করে ফেলা হ'বে, তা' ছাড়া অনেক পাড়াগাঁয়ে পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যেখানে টিউব ওয়েল হচ্ছে, আর লোকজনেরা সব কুঁয়ো এবং পুকুরের জলের পরিবর্ত্তে টিউব ওয়েলের জল

খাচ্ছে সেখানে ক্রমশঃ ম্যালেরিয়া কমে আসছে। এখানেও দু'টো টিউবওয়েল হয়েছে এবং আরও যাতে হয় সে চেষ্টা ক'রব।"

"তোমার যত সব পাগলামি! করছিলে ওকালতী, মন দিয়ে তাই কর, তা নয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সভার সভ্য হ'তে গেলে। এ সব প্রশান্তর বুদ্ধি। এমন জানলে আমি কখনই তাকে প্রশ্রয় দিতুমনা।"

শান্তা আরও কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু চাহিয়া দেখিল তাহার কথার দিকে মনোযোগ না দিয়া প্রকাশ একমনে পুস্তকের ভিতর আপনাকে নিমজ্জিত করিয়াছে, অপমানিত বোধে সে নিঃশব্দে তথা হইতে উঠিয়া গেল।

ভিতরে আসিয়া দেখিল তাহার পিস্তুত ননদ নিস্তারিণী তসরের কাপড় পরিয়া বড়ি দিবার জন্য কলাই বাটিতেছে। কাছে আসিয়া বলিল, "আমি কি তোমার কোন কাজে সাহায্য করব ঠাকুরঝি?"

"তুমি?'—সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে একবার চাহিয়া নিস্তারিণী বলিল, "কিন্তু তুমি যে এইমাত্র দাদার ঘরে ঢুকলে, বিছানায় ব'সলে। ও বিছানার কাপড়ে তো বড়ি দেওয়া চলবেনা। তোমার কোন শুদ্ধ কাপড় আছে তো পরে এস। তসর কিংবা মটকা।"

"কেন ধোয়ান পরিষ্কার কাপড় পরে রয়েছি, এটা অশুদ্ধ হয়ে গেল। একটা ময়লা তসরের কাপড় পরে এ'লেই সেইটে হ'বে খুব শুদ্ধ, বাবা তোমাদের কাজে আমার হাত দিতে না আসাই ভালো।—"

এমন সময়ে শোভা কোথা হইতে বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া ছুটিয়া মায়ের কোল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। নিস্তারিণী শশব্যস্ত হইয়া উঠিল, "ওরে থাম থাম, আমাকে ছুঁস্নি যেন। সব নষ্ট হয়ে যাবে একেবারে তা'হ'লে। ও বৌ, একটু গঙ্গাজল মাথায় নিয়ে কাপড়খানা ছেড়ে দাওগে। আমি এইমাত্র সদর দরজা হ'তে দেখছিলুম শোভা ওবাড়ীর বড়বাবুদের মুসলমান পেয়াদার হাত ধরে তার সঙ্গে কোথায় বেড়াতে যাচ্ছে। মেয়েটার জামা কাপড়গুলোও অমনই খুলে দিও।"

"আচ্ছা দিচ্ছি।"—শান্তা অপ্রসন্ন মুখে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল।

(২১)

রাত্রিবেলায় পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় চারিদিক প্লাবিত হইয়াছিল। সামনের সারি সারি নারিকেল বৃক্ষের পত্রান্তরালের অবকাশে জ্যোৎস্না ঝিকি মিকি করিতেছে। শয়ন ঘরে কাঠের তক্তাপোষে পরিষ্কার শুভ্র বিছানা পাতা, একপাশে একটা আমকাঠের সিন্দুক, জলের সরাই। হাতের তৈরী কড়ির আলনা। সন্ধ্যাবেলাকার দেওয়া ধূপধুনার গন্ধ এখনও ঘরের হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে। প্রকাশ শুইয়া মুগ্ধ নয়নে বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। বলিল, "শান্তা সহরের ইঁট

কাঠের দিকে কেবল দু'চোখ মেলে দেখলে জীবনটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নারিকেল গাছের পাতার ফাঁকে এই যে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি যে ছেলে মেয়েরা ছোট থেকে এই দেখে মানুষ হয় তাদের মনের গড়ন অন্যরকম হয়। তারা কল্পনা প্রবণ আদর্শবাদী সৌন্দর্য্য-প্রিয় প্রকৃতির হয়। পেটেন্ট ষ্টোনে বাঁধানো রাস্তার মত সাদামাটা হয়না। শোভা যদি চিরকাল কলকাতায় আর সহরে মানুষ হো'ত, এ সব জীবনে কখনও চোখে না দেখত, তার প্রতি আমরা অন্যায় করতুম।"

"হ্যাঁ, এখনই খুব ন্যায় করছি। একটা অজ পাড়াগাঁয়ে এনে তাকে ভরলুম!"

শান্তার কণ্ঠস্বরে হতাশা ধ্বনিত হইয়া উঠিল। "সাতটা নয় পাঁচটা নয় একটা মেয়ে তার প্রতি যথেষ্ট কর্ত্তব্য করা হ'লো।"

প্রকাশ বলিল, "তুমি কিছুতেই তোমার মন ব'সাতে পারছনা, নয় শান্তা? আমার কিন্তু খুব ভালো লাগছে। জীবনে খুব বড় একটা কিছু কেষ্ট বিষ্টু তুল্য লোক হ'তে পারলুমনা বলে আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই। এখানে আমার অনেক কাজ করবার রয়েছে। আমাদের স্কুলের ছেলেগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরতার সঙ্গে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের মনের কথা সব আমাকে খুলে বলে। ওদের কল্পনাতেও কখনো এর আগে আসে নাই যে মাষ্টারের কাছে বেত খাওয়া ছাড়া তাঁর সঙ্গে আর অপর কিছু সম্বন্ধ থাকতে

পারে। আমদের সঙ্গে মিশে ওদের মনের সে ধারণা আস্তে আস্তে দূর হচ্ছে। কিন্তু আমার এর চেয়েও বড় একটা প্ল্যান রয়েছে শান্তা। কেবল তোমার সাহায্য যদি পাই।”

“কি বলনা শুনি।”

“এখানকার ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের দুর্গতি আরো অনেক বেশি। ছেলেদের মধ্যে যাদের বুদ্ধি বেশি তাদের পথ একটা হয়ে যায়ই। এখানকার হাই স্কুলে পড়ে তারা বৃত্তি পায়, তারপরে সহরের বা জেলায় কোনখানে যেয়ে আরো লেখা পড়ার সুবিধা করে নেয়। কিন্তু মেয়েদের দুর্গতির আর অন্ত নেই।—আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় তাদের শিক্ষার জন্যে বা তাদের স্বাস্থ্যের জন্যে এতটুকু মাথা ঘামাবার দায় কারো নেই। শান্তা তুমি তোমার একটি মেয়ের কথা ভেবে রাতদিন মনে অশান্তি ক'রো, খালি তোমার মনে হয়, শোভা সহরে থেকে লরেটোতে পড়তে পেলেনা,— সঙ্গীত সঙ্ঘে গান শিখতে পেলেনা, কিন্তু এ কথাটা একবার মনে পড়েনা আমাদের এই সব খাড়াগাঁয়ের হাজার হাজার শোভার বয়সী মেয়েদের ভাগ্যলিপি কি? ছোট থেকে তারা অশিক্ষিতা খুড়ী মাসী দিদিমার কাছে থেকে থেকে পাকামি শেখে, গালাগাল দিতে ঝগড়া করতে কথা শুনিয়ে দিতে দিব্যি কাটতে খুব ভালো রকম করে শেখে। আর কিছু শিখতে পায়না। ছোট্ট থেকে মায়ের কোলের ছেলেটা বহন করে করে এদের বাড় বসে যায়। জীবনে যে কি অনন্ত সম্ভাবনা আছে

তার আভাষমাত্রও এরা জানেনা। আমার মনে মনে একটা সঙ্কল্প ছিল, আমাদের বাড়ীর নীচের তলায় ছোট ছোট মেয়েদের জন্যে একটি স্কুল করি। প্রথমে আরম্ভ হ'বে খুব অল্প ভাবে। তুমি পড়াবে যে কয়েকটি মেয়ে আসবে। শোভাও পড়বে তার সঙ্গে। তারপর যদি এর আয়তন বাড়ে, লোকে আগ্রহ ক'রে মেয়ে পাঠায় তখন আবার অন্য রকম ব্যবস্থা করা যাবে।"

শান্তা তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল, "লোকের নিন্দেয় তাহ'লে তো আর কাণ পাতা যাবেনা। এমনিতেই সুনামের অন্ত নেই। আমাকে সবাই আড়ালে বলে ম্লেচ্ছ। আচার বিচার নেই। খ্রীষ্টিয়ানী বিবিয়ানা। তার উপরে মেয়ে পড়াবার প্রস্তাব করলে আর কিছু বাকী রাখবেনা। হয়তো পড়তে কেউ মেয়েই পাঠাবেনা।"

"নাইবা পাঠালে, করলেইবা নিন্দে। তুমি তাতে বিচলিত হ'বে কেন? তুমি যে এদের অনেক উপরে। তোমাকে দেখে এরা শিখবে। তুমিই তো আলো দেখাবে, সে ভার তোমারই। আস্তে আস্তে দেখবে ওদের মুখরতা শান্ত হয়ে এসেছে, ক্রমেই আকৃষ্ট হচ্ছে। তখন মেয়েদের পড়তে পাঠাবে। কেবল একটু ধৈর্য্য আর সহিষ্ণুতা দরকার।"

"দায় পড়েছে আমার ধৈর্য্য আর সহিষ্ণুতা শেখবার। তুমি নিজের উচ্চাশায় জলাঞ্জলি দিয়ে পরোপকারের ব্রত মাথায় নিয়ে

বসেছ, আমার সে দায় নাই। আমার সমস্ত জীবনটা অন্ধকার হয়ে গেল. এখন আমি মেয়ে স্কুলের প্রস্তাব নিয়ে নেচে বেড়াই।"

প্রকাশ একটুখানি হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই তোমার সে দায় রয়েছে শান্তা। প্রশান্তর কথা ভাব, তার তো কোন অভাব নেই, জীবনে নেই কোন সংগ্রাম কোন দৈন্য, কিসের জন্যে সে আর তার মত কত শত ছেলে আর সব কাজে বিমুখ হয়ে পল্লীর প্রাণ প্রতিষ্ঠার দায় মাথায় নিয়ে এত পরিশ্রম করছে? এই নীরস অতীব নিঃশব্দ কাজ—যাতে না আছে সভা সমিতি করবার উত্তেজনা, না আছে হাততালি, চাঞ্চল্য, সেই কাজে কেমন করে তারা জীবন মন ঢেলে দিলে। মহাত্মা গান্ধীর কথা ভাবো, তাঁকে তো আজকের দিনে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে সবাই স্বীকার করছে,—তিনি কেন সমস্ত কাজ ফেলে এই কাজকে তাঁর মাথার মণি করলেন।—এই কাজই কেন হয়ে উঠ্‌লো তাঁর জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত। পনেরো বছর ধরে গান্ধী জাতীয় জীবনের কত বিভাগে কত রকম আন্দোলন করলেন, কিন্তু এখন বলছেন, সে সবের উপরে বড় কাজ পল্লীতে আলো জ্বেলে দিতে হবে। এ কাজ যদি এ'তই তাচ্ছিল্যের বলে মনে কর শান্তা, তাহলে পৃথিবীর এত বড় মানুষ এতে এমন করে সাড়া দিতে পারে?"

শান্তা নিঃশব্দে রহিল, আর কোন উত্তর দিলনা। জ্যোৎস্নায় চারিদিক মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। পার্শ্বের খাটে শোভা গভীর নিদ্রামগ্ন।

প্রকাশ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। তাহার জীবনের গভীরতম সঙ্কল্পে স্ত্রীর কাছ হইতে কোন সাড়া, কোন উৎসাহ পাইল না। :বিমুখ নারী কেবলই মনে মনে আলোচনা করিতে থাকিল, এখানে সে মেয়েকে ম্যাটিক পড়াইতে পাইবে না। এখানে না আছে একটা সিনেমা হাউস না আছে স্কুল কলেজ—"

(২২)

পিয়ন আসিয়া হাঁকিল, "একঠো রেজেষ্ট্রি চিঠি হ্যায়।"

নিজের নাম সহি করিয়া চিঠিখানা লইয়া আসিয়া প্রকাশ বলিল, "ব্যাপার কি? এ যে দেখছি প্রশান্তর কাছ থেকে এসেছে।"

চিঠিখানা খুলিয়া দেখা গেল প্রশান্ত লিখিতেছে,—

"বৌদি',

আপনার চিঠি দিনতিনেক আগে পেলুম। আপনি এত ভেঙ্গে পড়লেন কেন? পাড়াগাঁয়ে আপনার স্বামী কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন করেছেন, তাতে আপনি এত মর্ম্মান্তিক দুঃখ পেলেন। কিন্তু আমাদের দেশের শতকরা নব্বুইজন গ্রামে থাকে। তাদের সুখ দুঃখ ভাবনা চিন্তার ধারার প্রতি যারা উদাসীন, তারা তো দেশের প্রতি উদাসীন। অথচ আমাদের দেশে হয়েছে ঠিক তাই। শুধু আপনি কেন, দেশের শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ যারা তারা সকলেই এমনই ক'রে ভাবছে, উদাসীন দর্শকের মত চেয়ে আছে। দেশের অনন্ত

দুর্গতির দিকে চেয়েও দেখে না। কিন্তু যাক্ সে-সব বাজে কথা, আপনি কাতর অনুরোধ করেছেন, আমি যেন 'প্রকাশদা'র জন্যে একটা চাকরির সন্ধান রাখি। একটা চাকরির খোঁজ পেয়েছি। ল'-এড্ভাইসার। এক দেশী প্রকাণ্ড জমীদারের। বাবার সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। প্রকাশদা'কে তারা মনোনীত করেছে। আপনি পত্রপাঠ তাকে পাঠিয়ে দেবেন। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবেন। আপনাকে অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে, কিন্তু জানি, বলে কোন ফল নেই। মানুষের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী তার মনের চিন্তার ধারা কিছুতেই বদ্লায় না। তর্ক করে লাভ নেই। প্রকাশদা'র পত্রপাঠ ক'লকাতা আসা দরকার। পরশু তার ইন্টারভিউ করবার দিন। পাছে চিঠিখানা না পান তাই রেজেষ্ট্রি ক'রে দিলাম।"

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া শান্তা তাড়াতাড়ি চিঠিখানা প্রকাশের সম্মুখে মেলিয়া ধরিল। "দেখলে, মানুষের কি চিরদিনই সমান যায়! একটা না একটা সুযোগ তাকে ভগবান এনে দেন্ই।"

প্রকাশ অনেকবার চিঠিখানা পড়িয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, "দেখ শান্তা এই চিঠিখানা যদি মাস দুই আগে আসত, আমিও ঠিক তোমার মত আনন্দ রাখবার জায়গা পেতুম না। কিন্তু........."

"দেখো কিন্তু ক রোনা। ভগবান যদি দিন দিয়েছেন, তাহ'লে হেলায় তাকে নষ্ট ক'রে ফেলোনা। এইখানে এই অস্বাস্থ্যর

ম্যালেরিয়া পীড়িত পাড়াগাঁয়ে পঞ্চাশ টাকা মাইনের স্কুল মাষ্টারীতে সারাটা জীবন কাটাবে নাকি! আর তোমার সঙ্গে আমাদের শুদ্ধ জীবনটা মাটি ক'রে দেবে!"

বাইরে একদল ছেলে আসিয়া দাঁড়াইল,—তাহাদের মধ্যে একজন ভিতরে আসিয়া কহিল, "মাষ্টারমশায়, কণ্ট্রাকৃটর এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে চাইছেন। আমাদের স্কুলের জন্যে যে ঘর হ'বে, তার মোটামুটি খরচের হিসেব আর খসড়া ক'রে দিয়ে যাবেন। আপনি সেইটে নিয়ে গভর্ণমেণ্টের দরখাস্তর সঙ্গে দেবেন। তাহ'লে গ্রাণ্ট হ'বার সম্ভাবনা খুবই থাকবে। "আচ্ছা চল আমি দেখছি। যাচ্ছি এখনই ।"

মিনিট পাঁচেক পরেই পুনশ্চ আর একটি ছেলে আসিয়া কহিল, "মাষ্টারমশায়, "সার্কেল্ অফিসার খবর পাঠিয়েছেন, তিনি বিকেলের দিকে আসবেন। জঙ্গল পরিষ্কারের জন্যে যে দু'শো টাকা মঞ্জুর হয়েছে, তাতে কেমন কাজ হচ্ছে দেখতে আসবেন। শুনছি নাকি যদি খুব ভালো ফল দেখেন, তাহ'লে এ বিষয়ে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করবেন। আচ্ছা তাঁর থাকবার বন্দোবস্ত কোথায় হ'বে! আমাদের স্কুলের হলটা গুছিয়ে রাখব নাকি ?"

প্রকাশ একটুখানি ভাবিয়া বলিল, "না, তার চেয়ে আমারই একতালার সামনের ঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখব। তোমরা চল। আমি মিনিট পনেরোর মধ্যেই চললুম।"

শান্তা সামনেই একটু সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখন কাছে সরিয়া আসিয়া তিক্তকণ্ঠে কহিল, "এই সব বাজে কাজে তোমাকে সময় নষ্ট করতে হ'বেনা। মনে রেখো তোমাকে কলকাতা যাবার জন্যে সন্ধ্যের এক্সপ্রেস ধরতে হ'বে।"

প্রকাশ এক মুহূর্ত্ত স্ত্রীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "না, ধরতে হ'বেনা। এখান থেকে একমিনিটের জন্যেও আর আমার যাবার যো নেই শান্তা, এ আমি তোমাকে সত্যি করে বলছি।"

শান্তা অবাক হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, "তুমি ক্ষেপে গেলেন াকি? চিরকাল জীবনে দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে কেটে গেল, যদি হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে এমন সুযোগ এসেছে তুমি একটা খেয়ালের বশে তা ছেড়ে দেবে?"

"হ্যাঁ, ছেড়ে দেব। সেই জমিদারের ল' এড্‌ভাইসারের অভাব হ'বেনা। এখনই আমি যদি না নিই, হাজারটা দরখাস্ত আরো এসে পড়বে। কিন্তু এই অশিক্ষিত অন্ধকার আমারই জন্মভূমির পল্লী প্রান্তে আমার মত আর কেউ আসবেনা, আর কেউ তাকে এমন ভাবে ভালোবাসবেনা। আমি আর তাকে ছেড়ে যেতে পারবনা। তুমি এইমাত্র জীবনের দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামের কথা বলছিলে, সে যে কি বস্তু আমি তার কিছু কিছু আস্বাদ পেয়েছি। আমি আর বড়দরের চাকরি করে বড়লোক হ'তে চাইনে শান্তা, এই জীবন সংগ্রামে যারা বঞ্চিত, মুমূর্ষু;—তাদের যতটা পারি ভালোবেসে সাহায্য করে মানুষ করতে চেষ্টা করে জীবনটা কাটিয়ে দেব।"

সমাপ্ত।